কল্যাণী

এক

রায়চৌধুরী মশাই নানারকম কথা ভাবছিলেন ঃ প্রথমতঃ জমিদারীটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলে কেমন হয়?

ভাবতে গিয়ে তিনি শিহরিত হয়ে উঠলেন। অবস্থাটা অত খারাপ হয়নি।

কোনোদিনও যেন না হয়—ও রকম অবস্থা!

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কথা তিনি ভুলে যেতে চাইলেন।

হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল—

রায়চৌধুরী মশাই জ্বালিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শালিখবাড়ির নদীর পাশে তার দরদালানটা—রায়চৌধুরীদের তেতলা জমিদার বাড়ি; সেই ক্লাইভের আমলে তৈরি আধ—ইংরেজি আধ—মুসলমানী ধরণে একটা মস্ত বড় ধূসর পুরীর মতো; চারদিককার আকাশ, মাঠ, ধানের ক্ষেত, নদী, নদীর বাঁক, খাড়ি, মোহানা, চরগুলোকে উপভোগ করবার এমন একটা গভীর সহায়তা করছে—দৈত্যরাজের উঁচু কাঁধের মত এই প্রগাঢ় বাড়িখানা।

তেতলার পশ্চিম দিকে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে চৌধুরী মশাই দেখছিলেন সব—উত্তর দিকে ন্যাওতার মাঠ—ধূ ধূ করে অনেক দূরে ভিলুন্দির জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। এই মাঠে কত কি যে ব্যাপার কতবার হয়ে গেল—নিজের চক্ষেও চৌধুরী কত কিছু দেখলেন!

তারপর এল শান্তি—মাঠটা স্কুল কলেজের ছেলেদের ফুটবল গ্রাউন্ড হল, কখনো বা মীটিং হয় এখানে, কংগ্রেসের ক্যাম্প বসে, ডিস্ট্রিক্ট টিচারদের, মুসলমানদের, মাহিষ্য নমশূদ্রদের কনফারেন্স হয়; বেদিয়ারা আসে, বৈষ্ণববৈষ্ণবীদের আখড়া হয়ে ওঠে।

এই সমস্ত শান্তির (উন্নতি অবসরের) জিনিস। আগেকার অনেক গ্লানি পাপ কলঙ্কের ওপর এগুলো ঢের সান্ত্বনার মত।

(মাঠটার প্রায় সমস্ত জায়গাই এখন উলুঘাসে ভ'রে আছে—আর কাশে। কিন্তু ফুটবল খেলা আরম্ভ হবার আগেই মাঠের দক্ষিণ দিকটা বেশ পরিষ্কার করে নেওয়া হবে।)

বর্ষার মুখে শালিখবাড়ির নদীটা পেটোয়া হয়ে উঠেছে।

ইলিশ মাছের জালে জালে নদীটা ভরে গেছে; পশ্চিম মুখে নদীর কোলঘেঁষা একটা সরু লাল রাস্তার দিকে তাকালেন চৌধুরী—বিশ পঞ্চাশটা ইলিশের নৌকা জমা হয়ে গেছে ওখানে—আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত টাউনটার নাড়ীনক্ষত্রে ইলিশের চালান শুরু হবে।

কুড়ি পঁচিশটা স্টিমার তিন চারটা বড় বড় জেটির কিনার ঘেঁষে নদীর (ঘাটের কাছাকাছি) ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে; দু'একটা কয়লাঘাটার দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছে; সবসময়ই এমনি অনেকগুলে স্টিমার এই ঘাটে মোতায়েন হয়ে থাকে; এখানকার এ স্টিমার স্টেশন এ অঞ্চলে খুব বড়।

কলকাতার এক্সপ্রেস স্টিমার ছাড়ল।

চৌধুরী মশায়ের চুরুট জ্বলতে জ্বলতে নিভে গিয়েছে আবার।

জ্বালালেন তিনি।

জমিদারবাড়ির তেতলার কাছের আকাশটা ঘিঁষে কাকগুলো ভিলুন্দির জঙ্গলের দিকে চল্ল। পশ্চিমের গোলাপী পিঁয়াজী মেঘের ভিতর নলচের মত কালো কালো ঠোঁট মুখ পাখা নিচে সবুজ নাকি নীল জঙ্গল ধানক্ষেত রূপোর পৈঁছের মত নদী—শকুনের মেটে পাকা চিলের সাদা পেট সোনালি ডানা—রাত গাঢ় হয়ে নামবার আগে এইগুলো রঙের খেলা—রসের খেলাও বটে।

কিন্তু দু-এক মুহূর্তের শুধু—

শঙ্খচিলটা অন্তর্হিত হ'ল।

খানিকক্ষণ পরে পৃথিবী একটু চিমসে জ্যোৎস্না জোনাকী আর লক্ষ্মীপেঁচার দেশে এসে হাজির হয়েছে। (মন্দ নয়।) নিভন্ত চুরুটটা আবার জ্বালানো গেল।

চৌধুরী ভাবছিলেন ঃ বড় ছেলেটা বিলেত থেকে ফিরবে না আর তা হ'লে? আই-সি-এস পড়তে গিয়েছিল; কিন্তু আই-সি-এস পাস করবার মতো চোপা তো তার নয়; একটা টেকনিক্যাল কিছু শিখে এলে পারত; কিন্তু তাও তো এল না; এই আট বছরের ভিতর ফেরবার নামটি অব্দি করছে না; আগে খুব লিখত টিখত; এখন হদ্দ লুকোচুরি করছে। তাকে আর টাকা পাঠাবেন তিনি?

গুণময়ীর জন্যই—নাহ'লে দু-তিন বছর আগেই তিনি টাকা বন্ধ করে দিতেন।

ছেলেটা হয়তো বিলেতে বিয়ে করেছে; তার স্ত্রী ছেলেপুলের ফটোও নাকি কারু কারু কাছে পাঠায় সে—

না, টাকা আর তাকে পাঠাবেন না তিনি।

ছোট ছেলেটা হয়েছে কলকাতার এক লব্জা; এদ্দিনে বি-এস-সি হয়ে যেত। কিন্তু এখনো সেকেন্ড ইয়ারে রয়েছে; বাপের টাকায় সুখের পায়রার অনেক সুখই মেটাচ্ছে সে—কিন্তু গোলাপের তোড়া হাতে থিয়েটারের গ্রিনরুমে ঢুকে শালিখবাড়ির ছোট কর্ত্তা না কি...ভাবতে ভাবতে চৌধুরী বেকুল হয়ে পড়লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মেজ ছেলেটির কথা ভাবলে মন বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে—সে এখানে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে প্র্যাকটিস করছে—বছরখানেক ধরে। এরি ভিতর জমিয়ে নিয়েছে।

চৌধুরী বলেছিলেন ঃ হাইকোর্টে যাবে?

একটু সবুর কর বাবা।

একটু সবুর করে প্রসাদ হাইকোর্টে যাবে—হয়তো পিউনী জজ হবে।

চৌধুরীর মন পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল।

(তারপর তিনি) নিজের মেয়েটির কথা ভাবতে লাগলেন; কল্যাণী এবার চোখের অসুখের জন্য আই-এ দিতে পারল না। তিনিই নিষেধ করেছেন দিতে! আর কেন? পড়বার সখ—তা সে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঢের হয়েছে—ঢের—এইবার মেয়েটার একটা কিছু স্থির করতে হবে।

দুই

চৌধুরী মশাই সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না বটে, কিন্তু জীবনের প্রতি কাজে—প্রতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজেও পদে পদে বিধাতাকে মানেন তিনি। ভালো করলেও এ বিধাতাই করেছেন, অমঙ্গল করলেও এ বিধাতারই না জানি কি নিগূঢ় ইঙ্গিত—এমনি তার বিশ্বাস—অত্যন্ত স্পষ্ট—কেমন সরল—কি যে আন্তরিক—গভীর বিশ্বাস তার। (লোকটি) জানেন শোনেন অনেক; উনিশ শো এক সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে চৌধুরী বি-এ পাস করেছিলেন। সেই থেকে পড়াশুনার ঢের চর্চা নানা দিক দিয়ে করে এসেছেন। বাড়িতে মস্ত বড় একটা লাইব্রেরী আছে—আজো নতুন নতুন মোটাসোটা বই ঢের আসে কলকাতার দোকানপাট থেকে—বিলেতের ফার্মগুলোর থেকে অব্দি; নানারকম দেশী বিলিতী নিবিড় ম্যাগাজিন আসে সব। এত চিন্তা যুক্তি গবেষণার আবহাওয়া মানুষের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের তাল খসিয়ে উড়িয়ে ফেলে—কিন্তু তবুও চৌধুরী আজো কোনো কথা কাজ বা ব্যবহারের ধাপ্পাবাজি ভোজবাজি গোঁজামিলের ভিতরে নেই,—মানুষের মনের অতি উৎসুক চিন্তা ও প্রশ্ন যেন বারবধূদের মত (নয় কি?)—সে সবের হাত থেকে তাঁর ধর্মকে রক্ষা করেন তিনি, ন্যায়কে রক্ষা করেন, নিজের বিধাতাকে রক্ষা করেন।

যেন কখনো কোনো ব্যভিচার না হয়—অবিচার না হয় যেন—মঙ্গলময় ভগবান জীবনের পদে পদে প্রতিফলিত হয়ে চলেন যেন—চৌধুরী মশাই খুব খাঁটি আগ্রহে নিজের মনকে অনেক সময়ই এই সব কথা বলেন।

কল্যাণী কলকাতার থেকে এসেছে; ছোট ছেলে কিশোরও এসেছে। একদিন বিকেলবেলা প্রসাদ কোর্টের থেকে ফিরে বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে চুরুট টানছিল।

বাবা এসে আরেকটা ইজি চেয়ারে বসলেন।

প্রসাদ চুরুটটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল।

চৌধুরী বললেন—তা খাও; আমিও তো খাই। লাঙ্চ আমাদের দু'জনেরই ভাল আছে।

হাসলেন।

নিজেও চুরুট বের করলেন।

প্রসাদও টানতে লাগল।

চৌধুরী বললেন—এ বার কাজের কথা।

প্রসাদ বাবার দিকে তাকাল।

'তোমার দাদাকে আর টাকা পাঠাব না ঠিক করেছি।'

প্রসাদ চুপ করে রইল; সে তো বরাবরই বাবাকে বলে এসেছে দাদাকে টাকা পাঠান মানে জমিদারি আস্তে আস্তে গুটিয়ে ফেলা; প্রজারা খাজনা দিতে চায় না, গভর্নমেন্টকে রেভিনিউ দিতে হচ্ছে, সম্পত্তি ভেঙে খেতে হচ্ছে—ওকালতী করতে বাধ্য হতে হচ্ছে—অনেক কিছুই দাদার গুখখুরির জন্য।

পঙ্কজবাবু বললেন—অন্যায় হবে প্রসাদ?

প্রসাদ বললে—একেবারেই ওকে একটা পয়সাও আর কোনোদিন তুলে দেবে না এইটে আগে ঠিক করতে পার যদি—(তারপর কথা।)

পঙ্কজবাবু একটু স্থির থেকে বললেন—কি করে আর দেই?

প্রসাদ বললে—স্টেটে টাকা নেই বলে?

—না, তা নয়।

—তবে কি বাবা?

—টাকা এখনও—টাকা বিজলীকে পাঠাবার ক্ষমতা এখনও দু-চার বছর বেশ আছে আমার—কিন্তু—

পঙ্কজবাবু থামলেন—

প্রসাদ বললে—তা হ'লে দু'চার বছর আরো পাঠাও।

—তা পাঠাব না।

প্রসাদ একটু হেসে বললে—ওর চিঠি পেলে তোমার মন খুব উসখুস করে না বাবা? কোনো কল্পিত সঙ্কল্পই টেকে না আর তোমার। দাদা খুব চমৎকার চিঠি লিখতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ওর চিঠি এবার আর পড়বও না আমি—কেবল পাঠালে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

প্রসাদ ঘাড় হেঁট করে চুরুটটার দিকে তাকাচ্ছিল।

পঙ্কজবাবু বললেন—এইই ঠিক হবে।

তাঁকে খুব দূর মনে হ'ল।

প্রসাদকে বললে—তোমার মাকে বলিনি।

—কি দরকার বলবার?

—মিছেমিছি কেন আর?

—অন্যায় হবে না?

—কিসে বাবা?

—এই যে তোমার মার কাছে গোপন করলাম—অন্য কাউকে বলিনি—অন্যায়? Not sending money—অন্যায়?

প্রসাদ চুরুটের মুখের থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলে কিছুক্ষণ ক্লান্ত হয়ে বসে রইল। পরে বললে—আমাদের খেতে হবে তো?

—তাই তো।

কিশোরকে দেখতে হবে, কল্যাণীর কথা ভাববার রয়েছে—

পঙ্কজবাবু বললেন—না, না, অন্যায় হবে না কিছু। কত ছেলে মরে যায় মা'রা সহ্য করে না?

বললেন—আমি তো মনে করি বিজলী মরে গেছে—তোমার মাও সেরকম ভাবতে পারবেন না?

প্রসাদ বললে—না যদি পারেন তিনিও মরে যাবেন—

পঙ্কজবাবু বিস্মিত হয়ে প্রসাদের দিকে তাকালেন।

প্রসাদ বললে—কিন্তু তিনি মরবেন না। কে কার জন্য মরে?

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল—

প্রসাদ বললে—কিন্তু মা যেন এ সবের একটুও আঁচ না পায়,—তা হলে খুঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমাকে দিয়ে টাকা পাঠিয়ে ছাড়বে—

পঙ্কজবাবু বললেন—তা বটে—

প্রসাদ বললে—ঘোঁট আর কোরো না কিছু—টাকাটা বন্ধ করে দিয়ে—

গুণময়ী এক মুহূর্তের জন্য এসে দাঁড়ালেন—শাড়ীতে হলুদ লঙ্কার চ্যাপসা, হাত পা গায়ে মশলার গন্ধ মাছের মিষ্টি আঁশটে গন্ধ—একেবারে রান্নাঘরের থেকে ছুটে এসেছেন—

প্রসাদের দিকে তাকিয়ে গুণময়ী বললেন—একেবারে তিনটে রুইমাছ ভেট পাঠিয়েছে।

—কারা মা!

ঘোষালরা।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—এক একটা রুই যেন এক একটা সোমথ মানুষের বাচ্চা—এমন তরতাজা মাছ—আহা কাটতেও কষ্ট হয়—

পঙ্কজবাবু বললেন—তা হ'লে কাট কেন—

—আহা, এক দিন ভালো করে মাছের কালিয়া হল না। যাই—আমি না রাঁধলে আবার ঐ বামুনের রান্না খেতে পারবি প্রসাদ?

প্রসাদ মাথা নেড়ে বললে—তা পারব না আমি—

গুণময়ী বললেন—আহা, বিজলীও পারত না—

প্রসাদ ফু ফু করে হেসে বললে—আজ খ্রিস্টানের রান্না খাচ্ছে—

গুণময়ী হতাশ হয়ে বললেন—সে কি রকম রান্না রে?

—সে কি রান্না। সব সেদ্ধ—শালগম সেদ্ধ—মুলো সেদ্ধ—বিট সেদ্ধ—স্যালাড—আধসেদ্ধ মাছ—আঁশটে।

গুণময়ী একটা খোঁচা খেয়ে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পঙ্কজবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন—

পরে বললেন—মেম বিয়ে করেছে দেশে আসতে চায় না, মা বাবা ভাই বোন কারুর কাছে একখানা চিঠি অব্দি না—আমার কাছে শুধু সেই টাকাকড়ির চিঠিগুলো ছাড়া—এ কেমন?

প্রসাদ বললে—কেমন অস্বাভাবিক যেন।

—আমাদের এস্টেট তো খুব বড় নয়—নানা দিক দিয়েই জড়িয়ে গেছে—তার ওপর নবাবের হালে এই আট বছর ওকে টাকা পাঠালাম—ও যা পেত তার চেয়ে ঢের বেশি ওকে দেওয়া হয়ে গেছে—

পঙ্কজবাবু থামলেন—

তারপর বললেন—কাজেই দ্বিধার কিছু নেই—যদি আমি—

প্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—না প্রসাদ?

কিন্তু মন যেন পঙ্কজবাবুর সায় পাচ্ছে না—কোথায় যেন কেমন কি খোঁচ থেকে যায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের এই সঙ্কোচ বাঁধাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে বললেন—টাকা পাঠাইলে বা হবে কি—কোনো ভালো কাজে তো নয়—থিয়েটার রেসে ওড়াবে। তা ছাড়া, নিজে সে ঢের বড় হয়েছে এখন; নিজের ঘাড়ের দায়িত্ব এখন ভালো করে বোঝা উচিত তার। নিজের রোজগার করা উচিত তার। না করতে পারে—আসুক এখানে—আমরা দেখব সব। নাহ'লে এক পয়সাও পাঠাব না।

(পরদিন পঙ্কজবাবু প্রসাদকে বললেন—সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিজলীকে আর এক খানা চিঠি লিখলাম এই। না যদি শোনে, আর টাকা পাঠাব না। এ বার দেড় হাজার পাঠালাম—আধাআধি কমিয়ে দিয়েছি—

কিন্তু কয়েক দিন পরে আরো দেড় হাজার পাঠিয়ে দিলেন তিনি।)

পর দিন সকাল বেলা প্রসাদ ছাড়া আর সকলেই ছিল তেতলার পুব দিকের বারান্দায়।

কল্যাণী বললে—বাবা, ন্যাওতার মাঠ কেন বলে? ন্যাওতা মানে কি?

—কী জানি।

কিশোর বললে—শব্দটা কি আরবী না ফারসী না ইংরেজি—

পঙ্কজবাবু বললেন—জানি না।

কল্যাণী বললে—কোনো ডিকশনারিতে এর মানে পাবে না ছোড়দা—

—তবে ন্যাওতার মাঠের মানে কি?

—সত্যি, ন্যাওতার মাঠ ওটাকে বলে কেন?

—কি অদ্ভুত শব্দ

—কোনো মানে নেই—কি বিশ্রী

পঙ্কজবাবু অবিশ্যি মানেটা জানতেন—(অন্তত) যে প্রবাদ অনেক দিন থেকে এ মাঠের সম্পর্কে এ অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে এসেছে তার সমস্তটুকুই জানতেন তিনি। কিন্তু সে সব কাহিনী বলতে গেলে পূর্বপুরুষদের দু'একটা গ্লানি বেরিয়ে পড়ে—কাজেই বললেন না কিছু।

কল্যাণী বললে—ভিলুন্দির জঙ্গলই বা কি?

—তাই তো—

—আমি অনেক দিন ভেবেছি—কোনো মানে বের করতে পারিনি—

—আমিও না

কিশোর বললে—ভিলুন্দি বলে আবার একটা শব্দ আছে না কি কোথাও?

কল্যাণী বললে—ছাই আছে।

একটু পরেঃ কোন ডিকশনারিতে পাবে না তুমি ছোড়দা

কল্যাণী বললে-কত সুন্দর সুন্দর নাম দিতে পারত না ছোড়দা? তা না ভিলুন্দির জঙ্গল—

পঙ্কজবাবু বললেন— আচ্ছা বেশ।

বললেন—ও নাম আমার কাছে ঢের সুন্দর শোনায়।

এই জঙ্গলের সম্পর্কেও অনেক দিন থেকে একটা কাহিনী চলে আসছে; কিন্তু নানা কারণে সেই গল্পটাও এদের কাছে আজ তিনি পাড়তে পারলেন না।

কল্যাণী বললে—মোটের ওপর এ জায়গাটা আমার ভালো লাগে না—

পঙ্কজবাবুর হাত থেকে খবরের কাগজ আস্তে আস্তে তাঁর কোলের ওপর পড়ে গেল—

কল্যাণীর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে তিনি বললেন—ভালো লাগে না নাকি? এ জায়গাটা তোমার ভালো লাগে না কল্যাণী?

—নাঃ!—

—কেন?

কল্যাণী বললে—বড্ড পাড়াগাঁর মত—

কিশোর বললে—হ্যাঁ, একটা ডিস্ট্রিক্ট টাউন—জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের হেড কোয়ার্টার ওমনি পাড়াগাঁ বলে দিলেই হল আর কি!

কল্যাণী বললে—তা হোক গে—

গুণময়ী বললেন—তা ছাড়া মেয়ে আমার এই কলকাতা থেকে নেমেছে, আহা, একটু একলাটি লাগবেই তো!

পঙ্কজবাবু বললেন—আমাদের এ দিকটা আবার একেবারে শহরের এক প্রান্তে কি না—

কল্যাণী বললে—কি কেবল দিনরাত ঘুঘু ডাকে—আমার ভালো লাগে না—

কিশোর হেসে উঠল—

বললে—সেই হরিণ মারার রাইফেলটা নিয়ে এক বার বেরুতে হবে—জান মা, আমি লিলুয়াতে গিয়ে প্রায়ই পাখি মারি—ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুরগি, বালিহাঁস—হাত বেশ পেকে গেছে এখন—

কিশোরের কথায় কেউ কান দিচ্ছিল না—

গুণময়ী বললেন—তুমি কেন দিনরাত ঘুঘুর ডাক শুনতে যাও কল্যাণী

—বাঃ মার যেমন কথা ঘুঘু ডাকবে, আমি শুনব না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর বললে—তুমি বুঝি শোন না মা?

পঙ্কজবাবু বললেন—কৈ, আমার তো ঘুঘুর ডাক খারাপ লাগে না।

গুণময়ী বললেন—আমারও না।

কিশোর বললেন—তা তোমরা গেঁয়ো বলে।

পঙ্কজবাবু বললেন—বাস্তবিক

কল্যাণী বললে—এমন টেনে টেনে ডাকে; সারাদিন—সারা দুপুর—শুনতে শুনতে আমার কিছু ভালো লাগে না আর—তার ওপর ক্যারম বোর্ড নেই; তার খেলব কাদের নিয়ে—কেউ নেই—সে রকম কোনো লোকজন নেই, একটু সিনেমা দেখতে পারা যায় না, থিয়েটার নেই, গান নেই—সব সময়ই ঘরদোর এমন থম থম করছে।

কিশোর হো হো করে হেসে উঠল—

পঙ্কজবাবু বললে—তুমি তাহ'লে ক্যারম খেলতেও শিখেছ—?

কল্যাণী বললে—কবে শিখেছি!

—বোর্ডিঙে গিয়ে?

—বাঃ, এখানেই তো—

—এখানে?

—বাঃ, ছোড়দার একটা বোর্ড ছিল—

পঙ্কজবাবু বললেন—ওঃ—

বললেন—বিলিয়ার্ডস খেলতে জান কল্যাণী?

—না।

—কলকাতায় খুব বায়োস্কোপ দেখতে?

—হ্যাঁ

—কার সঙ্গে যেতে?

—কল্যাণী একটু ফাঁপরে পড়ল—

বললে—মেয়েদের সঙ্গেই যেতাম

—তা যেতে দেয়—

—দেয়—

পঙ্কজবাবু বললেন—আর থিয়েটার?

থিয়েটারেও সে গিয়েছে বটে ঢের—ছোড়দা আর তার বন্ধুদের সঙ্গে—কিন্তু সে সব কথা চেপে গেল কল্যাণী। বললে—না, থিয়েটারে আমি যাই নি বাবা।

—কোনো দিনও না?

—না

—তবে যে বলছিলে?

কল্যাণী বললে—বললামই তো যাইনি

—কেন যাওনি

—তোমার অনুমতি না নিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি না—তাই—

পঙ্কজবাবু বললেন—এবার আমি যদি অনুমতি দেই তাহ'লে যাবে?

কল্যাণী দু'এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললে—আমি আরো বড় না হ'লে তুমি কি অনুমতি দেবে বাবা?

পঙ্কজবাবু একটু থেমে বললেন—হয়তো আমি কোনোদিনই তোমাকে অনুমতি দেব না—থিয়েটার দেখতে।

কল্যাণী একটু বিস্মিত হল, আঘাত পেল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে সব মুছে গেল তার; বাবা থিয়েটার দেখতে বারণ করলে বিশেষ কিছু আসে যায় না, টিকিট কাটবার পয়সা থাকলেই হয়—জীবনের এমন এক রকমের সত্যকে তার ভাইদের সঙ্গে সেও অধিগত করেছে। অধিগত করতে গিয়ে পঙ্কজবাবুর ছেলেমেয়েদের মধ্যে কল্যাণীকেই সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হয়েছে—অধিগত ক'রেও তারই সবচেয়ে কম শান্তি। কিন্তু তবুও সংস্কারহীন গণ্ডীহীন সুবিধাবাদের জীবনকেও সেও আয়ত্ত করেছে—

পঙ্কজবাবু বললেন—তোমার বাপ মা ভাইদের মধ্যে এসেও যে তোমার ভালো লাগে না—একটা ক্যারাম বোর্ড তাস বায়োস্কোপ গল্প গুজব গান কলকাতার সব আনুষাঙ্গিক না হলে তোমার যে চলে না এমনতর মনের ভাবটাকে তোমার পরিত্যাগ করতে হবে। এখানেই তোমার মন বসাতে হবে। তোমার জন্য একটা ক্যারাম বোর্ড কিনে দেব না আমি, তাসও খেলতে পারবে না, এখানে একটা বায়োস্কোপ হল হয়েছে সেখানেও যেতে দেব না তোমাকে আমি—কিন্তু—

কল্যাণী কাঁদছিল—

পঙ্কজবাবু বললেন—কিন্তু তোমার মা যেমন এই বাড়িতে বসে ঢের পরিতৃপ্তি পাচ্ছেন সে রকম একটা তৃপ্তি ধীরে ধীরে বোধ করা তোমার পক্ষেও সম্ভব হবে।

কল্যাণী চোখের জল মুছতে লাগল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঙ্কজবাবু বললেন—এখানে কোনো অশান্তি নেই তো—ভালো লাগবে না কেন তোমার?

বললেন—শালিখবাড়ি তোমার ভালো লাগে না—তোমার বাপ-মা ভাইদের ভিতরে এসেও তোমার ভালো লাগে না—এমন কথাও তুমি বলেছিলে।

কল্যাণীর আবার কান্না এল, কিন্তু জোর করে নিজেকে নিরস্ত করে রাখল সে।

পঙ্কজবাবু বললেন—তুমি এদ্দিন চাল যা শিখেছ ভুল শিখেছ—

সকলেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। পঙ্কজবাবু আবার বললেন—সব ভুল শিখেছ—

কল্যাণীর মনে হল তার বাবাই ভুল শিখেছেন—কত বড় বড় লোক থিয়েটার দেখে, বায়োস্কোপ দেখে, নাচ গান মজলিসে ফুর্তি করে, এ রকম একটা পাড়াগাঁয় এলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে—তাদের কি ভুল শিক্ষা? কক্ষণো না। তার বাবাই যেন কেমন কঠিন ধরণের মানুষ—

কিশোরের মনে হ'ল কল্যাণী তো ঠিকই বলেছিল, এ জায়গা আবার ভালো লাগে কার? কোনো ভুল করেনি—তার বাবার শিক্ষাই অসম্পূর্ণ।

গুণময়ী ভাবছিলেন, আহা, মেয়েটাকে মিছেমিছে কাঁদাচ্ছেন কেন।

পঙ্কজবাবু বললেন—শুধু কলেজে পড়লেই হয় না, ডিগ্রি নিলেই হয় না—বই তো আমিও ঢের পড়েছি—

থামলেন।

বললেন—মস্ত বড় একটা লাইব্রেরী রয়েছে আমার—

বললেন—অনেক বড় বড় লেখকদের অনেক বই আছে। তারা নাকি চিন্তাশীল—মনীষী—ঋষি—কত কি। কিন্তু যত অদ্ভুত কথা তারা বলেছে সেই সব যদি মানতাম তা হলে একটা মস্ত বড় ব্যভিচারী জমিদার হতাম আমি আজ—অনাচারকেও ধর্ম মনে করতাম। কিন্তু সে সব ভুল।

অনেকক্ষণ বসে শিক্ষার ব্যাখ্যা করলেন তিনি, ছেলেমেয়েদের শেখালেন ধর্ম কি, নীতি কি, ধর্ম নীতি চরিত্র ছাড়া যে কোনো শিক্ষা হতে পারে না বললেন তা, বিধাতা যে কি রকম মঙ্গলময় কত মঙ্গলময় খুলে বললেন।

আগাগোড়া সমস্ত কথার মধ্যেই এর ঢের আন্তরিকতা—আগ্রহ ছিল। কিন্তু এর একটা কথাও গ্রাহ্য করল না ছেলেমেয়েরা, গ্রাহ্য করল না।

তাদের মনে হ'ল বাবার চেয়ে জীবনটাকে তারা ঢের বেশি বোঝে। কল্যাণীর মনে হল বাবার মনে কষ্ট না দিয়েও তো থিয়েটার দেখা যায়—বাবা না জানলেই হ'ল; কলকাতায় যেমন সে বরাবর চলে এসেছে তেমনিই চলবে। বাবার উপদেশ শুনবার পর নিজের রকমটাকে কোনো দিক দিয়ে কোনোভাবে বদলাবার কোনো তাগিদ বোধ করল না কল্যাণী। জীবনটাকে সে নিজের রুচি অনুসারে চালাবে—বাবা হয়তো একটু আধটু কষ্ট পাবেন; কিন্তু প্রায়ই তো জানবেন না তিনি। কল্যাণীর লুকোচুরির সম্বন্ধে পঙ্কজবাবু যাতে কোনো দিনও কিছু না জানতে পারেন মনে মনে তারি নানা রকম দুঃসাধ্য উপায় বাৎলাচ্ছিল মেয়েটি। মন তার হয়রান হয়ে উঠেছিল। এক সময় মনে হল; বাবা তো চিরকাল বেঁচেও থাকবেন না।

তিন

আষাঢ় মাস—কিন্তু ঠিক যেন কার্তিক মাসের আকাশ—এমনই নীল—এমনই পরিষ্কার—ন্যাওতার মাঠের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আর ভিলুন্দির জঙ্গল—এমন গাঢ় সবুজ—গাঢ় নীল—রোদের সোনার গুঁড়ি জঙ্গলটার মাথার ওপর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত একটা জরির পাড়ের মত চলে গিয়েছে যেন—কোন্ পরীদের যেন—এমন বিচিত্র।

পঙ্কজবাবু বললেন—কল্যাণী এখনো ঘুমোচ্ছে—

মেয়ের মাথার ওপর হাত রাখলেন তিনি—

বললেন—আর ঘুমোয় না—

কল্যাণী ঘুমের গলায় বললে—বাবা আমি এখন উঠব না

—কেন?

—আমার ঘুমোতে ভালো লাগছে

সে পাশ ফিরল।

একটা কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে অলসতার নিবিড় আরামে মেয়ের সমস্ত দেহ ভরে উঠছে আবার পঙ্কজবাবু দাঁড়িয়ে দেখলেন—

গুণময়ী ছিলেন; বললেন—থাক্—ও ঘুমোক্।

পঙ্কজবাবু সে কথায় কোনও কান না দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে পুবের দিকে জানালাটা খুলে দিলেন—চড়চড়ে রোদে কল্যাণীর চোখ মুখ মাথা পুড়ে উঠল যেন।

কল্যাণী বিছানার ওপর উঠে বসে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললে—বাবা, তোমার এই কাজ।

পঙ্কজবাবু বললেন—অনেক ঘুমিয়েছ তুমি—

তিনি আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন—কল্যাণী নাক মুখ খিঁচিয়ে বললে—অনেক ঘুমিয়েছি তাতে তোমার কি বাবা।

গুণময়ী বললেন—খুকি হোস না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমিও আমার পেছনে লেগেছ মা

—এত দেরী করেই বা তুই উঠিস কেন?

—যটার সময় খুসি তটার সময় উঠব, তাতে তোমাদের কি?

পঙ্কজবাবু বললেন—নাও, এখন ওঠো, বিছানা ঝেড়ে ঘর গুছিয়ে একটু লক্ষী মেয়ের মত হও।

কল্যাণী বললে—আমি উঠব না।

পঙ্কজবাবুর সাক্ষাতেই শুয়ে পড়ল সে।

গুণময়ী বললেন—থাক্।

কিন্তু কল্যাণী উশখুশ করে সবার চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেই উঠে বসল আবার। উঠে বলস, চুপ করে নখ খুঁটতে খুঁটতে।

বললে—বিছানা আমি ঝাড়তে পারব না।

গুণময়ী বললেন—আমি ঝেড়ে দেব যা—

পঙ্কজবাবু বললেন—না, তোমার নিজেরই ঢের কাজ আছে—মেয়ের কাজের জন্য তোমাকে আমি আটকে রাখব না—

কল্যাণী বললে—ঝিটা আছে কি করতে? ওসমানকেই বা কিসের জন্য রাখা?

পঙ্কজবাবু বললেন—তাদের কাজ আছে—

কল্যাণী গরগর করতে করতে বিছানাটা ঝাড়ছিল—ঝেড়েঝুড়ে বিছানাটা পাট করতে করতে বললে—কাজ না হাতী! ওসমানটার আবার কাজ! মেজদার বিছানা রোজ সাফ করে পাট করে দিচ্ছে—আর আমার বেলাই সব—

গুণময়ী বললেন—তোর মেজদার সঙ্গে তার কি কথা!

—ছোড়দারও তো

গুণময়ী বললেন—তারা তোমার চেয়ে বড়—

—তা বলছ কেন? বল যে তারা ছেলে সেই জন্যই তাদের সব দিক দিয়েই সুবিধে—

পঙ্কজবাবু বললেন—সে কথা সত্য নয় তো কল্যাণী

কল্যাণী বাপের দিকে তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলতে যাচ্ছিল 'সত্য নয়? সত্য কি মিথ্যা আমি জানি না তো?' কিন্তু এমন কান্না পেল তার—বাপের সঙ্গে এই সব নিয়ে তর্ক করা এমন নিরর্থক অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল যে ঘাড় হেঁট করে অত্যন্ত স্তব্ধ হয়ে ঘরের কাজ করে যেতে লাগল সে।

গুণময়ী বললেন—এই তো লক্ষী মেয়ে—

পঙ্কজবাবু বললেন—কিন্তু একদিন লক্ষী হলে তো চলবে না—রোজই এই রকম করতে হবে।

গুণময়ী বললেন—তা রোজই হবে—

পঙ্কজবাবু বললেন—এখন আটটা বেজেছে জান কল্যাণী—

কল্যাণী অধোমুখে অস্ফুট স্বরে বললে—বাজুক

সে কথা গুণময়ী বা পঙ্কজবাবু কারুর কানেই প্রবেশ করল না।

পঙ্কজবাবু বললেন—তোমার মা সাড়ে চারটার সময় উঠেছেন—আমি উঠেছি পাঁচটার সময়—আর তুমি ঘুমোলে আটটা অব্দি—

কল্যাণী কিছু বললে না।

পঙ্কজবাবু বললেন—এমনি তো একদিন নয়, কলকাতা থেকে এসে অব্দি রোজই এইরকম অনাচার করছ তুমি—

কল্যাণী চুপ করে রইল।

পঙ্কজবাবু বললেন—বোর্ডিঙে ক'টার সময় উঠতে?

—আটটা ন'টা—শীতকালে দশটার সময়ও উঠেছি।

পঙ্কজবাবু এক আধ মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকে বললেন—এ তারা সহ্য করে? এর জন্য কোনো প্রতিবিধান নেই তাদের? কোনো শাস্তি নেই?

কল্যাণী গর্বের সঙ্গে বললে—না।

—রোজি এমন দেরী করে উঠতে তুমি?

—হ্যাঁ

গুণময়ী বললেন—আর সব মেয়েরা?

—যে যখন খুসি উঠত।

বোর্ডিং যে এ বাড়ির চেয়ে ঢের স্বাধীনতা ও ঢের তৃপ্তির জায়গা বাপ মাকে সে কথা বুঝতে দিয়ে কল্যাণী মর্যাদা বোধ করতে লাগল, হৃদয় তার প্রসন্ন হয়ে উঠল।

পুবের দিকের জানালাটা বাবা খুলেছিলেন। কল্যাণী এবার জানালাটার কাছে গিয়ে দড়াম করে সেটা বন্ধ করে তারপর নিজের হাতে ধীরে ধীরে সেটা খুলে দিল মেলে দিল বাবার চেয়ে ঢের নিপুণতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে।

মন তার তৃপ্ত হয়েছে।

অভিযোগের বিশেষ কিছু নেই এখন আর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

সেদিনই-বেলা নটার সময়।

কল্যাণী দোতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে কি যেন পড়ছিল।

গুণময়ী বললেন—কি পড়ছিস রে?

—একটা নভেল।

—তোর বাবা তোকে ডাকছেন—

—আমি পড়ছি

গুণময়ী একটু বিস্মিত হয়ে বললেন—পড়ার বই তো নয়—

—তা নাই বা হোক পড়ছি তো—

—বাঃ

আমি যাব না

—আঃ কি যে বলে কল্যাণী।

—বলো গিয়ে বাবাকে যে আমি যেতে পারব না

—দিক করিস নে—চল্—বাগানে অপেক্ষা করছেন

—কোথায় অপেক্ষা করছেন?

—বাগানে

—বাগান আবার কোথায়? বাগান! একটা কামিনী গাছ আর দু'টো বকুল গাছ নিয়ে বাগান! ক্যানার ঝাড় নিয়ে বাগান! বাগান!

কল্যাণী উঠে দাঁড়াল—

বললে—কিসের জন্য ডেকেছেন?

—জানি না।

—চুরুট খাচ্ছেন তো?

—কি যে বলিস কল্যাণী

কল্যাণী বললে—নিজের বেলায় বাবার কিছুতেই কিছু না—আর একটু ঘুমুচ্ছিলাম বলে তিনি আমাকে বললেন কলকাতার থেকে এসেই অনাচার আরম্ভ করেছ—অনাচার শব্দের মানে কি তা তিনি জানেন যে বড় নিজের মেয়েকে অনাচারী বলছেন।

বাগানে ধীরে ধীরে গেল কল্যাণী—মার সঙ্গে। একটা বকুল গাছের নিচে বেতের চেয়ারে বসেছিলেন পঙ্কজবাবু।

গুণময়ী বললেন—তা যা; তা যা। জমিদার মানুষ—একটু চুরুট খান। কিন্তু এই ত্রিশ বছর ধ'রে তো আমি দেখে আসছি—এ ছাড়া আর কোনো বদ অভ্যাসই তাঁর নেই। এমন সৎ ধার্মিক লোক আমি আমার জীবনে দেখিনি—

গুণময়ীকে বললেন—আচ্ছা যাও তুমি।

গুণময়ী অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

বেতের চেয়ার মোড়া ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল কয়েকটা; কল্যাণী একটাতে বসল।

পঙ্কজবাবু বললেন—তুমি কলকাতায় যাবে কি আর?

—কেন যাব না?

—পরীক্ষা দেবে?

—নিশ্চয়ই দেব বাবা

—বলেছিলে যে তোমার চোখের অসুখ হয়েছে—

—তা হয়েছিল—

—কৈ, চশমা তো দেখছি না

—সে রকম অসুখ নয়—

পঙ্কজবাবু বুঝতে পারছিলেন না—

কল্যাণী বললে—সাধারণত স্মেলিং সল্ট শুঁকতাম; কপালে উইন্টো ঘষতাম; ক্যাফি অ্যাসপিরিন কয়েক ফাইল খেয়েছি; নিউরেলজিয়া হয়েছিল—

—নিউরেলজিয়া?

—হ্যাঁ বাবা।

—চোখ খারাপ হয়নি?

—না বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—চোখে স্পষ্ট দেখতে পাও?
—পাই তো
—পড়তে গিয়ে কোনো কষ্ট হয় না?
—না
—চশমা লাগবে না তা হ'লে?
—না
—চোখের অসুখ নয় বলছ?
—না, চোখের অসুখ নয়—
—ডাক্তার দেখিয়েছিলে?
—না, কি দরকার?
—আচ্ছা চলো আজ এক ডাক্তারের কাছে—
—এখানে?
—হ্যাঁ, আই-স্পেশ্যালিস্ট তিনি
কল্যাণী বললে—আমি বললামই তো চোখের অসুখ নয়—
—দেখানো ভালো
—এই গেঁয়ো হাতুড়ের কাছে? তা হবে না।
কল্যাণী বললে—চোখ কি মানুষের এতই সস্তা?
পঙ্কজবাবু বললেন—অকুলিস্ট—বিলেত থেকে পাস করে এসেছেন—
কল্যাণীর একটু সম্ভ্রম হ'ল ঃ বললে—তবুও—কলকাতায় গিয়ে দেখালে ভাল হত না?
পঙ্কজবাবু বললেন—আমার গাড়ি ঠিক রয়েছে—তুমি চল
—এখুনি?
—হ্যাঁ
দু'জনেই গেল।
এগারোটার সময় বাড়িতে ফিরে এসে কল্যাণী বললে—আমার এত যে চোখ খারাপ তা তো বুঝিনি বাবা—
গুণময়ী বললেন—খুব খারাপ?
পঙ্কজবাবু বললেন—চোখ দু'টো আধাআধি নষ্ট হয়ে গেছে—
গুণময়ী অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে বললেন—অন্ধ হবে না তো?
কল্যাণী হো হো করে হেসে উঠল।
বললে—কি বল যে তুমি মা! দেখ তো বাবা মা কি রকম ভয় পেয়ে গেছে—
পঙ্কজবাবু বললেন—তোমার মাইনাস সেভেন—ডাবল লেন্স লাগবে—অ্যাস্টিগ্‌মাটিজম রয়েছে—
কল্যাণী বললে—কিন্তু এত সব কি করে হ'ল—আমি কেন বুঝিনি বাবা?
পঙ্কজবাবু একটা ঢোঁক গিলে একটু পরে বললেন—সেই জন্যই তো তোমাকে আর ছেড়ে দেব না ভাবছি—
—তার মানে?
—আর পড়াশুনা ক'রে কি করবে কল্যাণী?
—সে কি কথা বাবা!
গুণময়ী বললেন—ঠিকই তো বলেছেন উনি—এমন চোখ নিয়ে তুমি কি পড়বে আর—
—আমি পড়বই।
পঙ্কজবাবু বললেন—বাড়িতে বসে এক আধটু পড়তে পার—
আমি কলেজে পড়ব।
পঙ্কজবাবু হেসে বললেন—না তা পড়বে না; তার কোনো প্রয়োজন নেই।
বাবার মুখে কেমন একটা নিরেট নির্মম শাসন দেখা দিল—সেই সকাল বেলাকার মত, যখন বিছানার থেকে কল্যাণীকে উঠতেই হল—
কল্যাণী বললে—না, না, আমি ছোড়দার সঙ্গে কলকাতায় যাবই
—তাই বল—কলকাতায় যাবে; (কলকাতায় যাবে—কোনো নিয়মের ভিতর থাকবে না—) ফূর্তি করবে,—কিন্তু পড়াশুনা তোমার আর হবে না।
কল্যাণী আঁচল কামড়ে ধরে বললে—আমি পাস করবই—
গুণময়ী শঙ্কিত হয়ে বললেন—পাস! সেই গুষ্টির বই গেলা বসে বসে আর চোখ খোয়ানো!
পঙ্কজবাবু বললেন—পাস না করলেও তোমার চলবে।
কেমন নির্মম হৃদয়হীনভাবে বললেন তিনি।
কল্যাণী কাঁদ কাঁদ বললে—এ কি কথা তোমরা সকলে মিলে বলছ আমাকে!
সে কেঁদে ফেলল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণময়ী বললেন—থাক, যেও কলকাতায়—কিন্তু

পঙ্কজবাবু কল্যাণীর ঘাড়ে হাত রেখে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—না, মেয়ে আর কলকাতায় যাবে না; বাবার কাছে থাকবে—মায়ের কাছে থাকবে—চোখ ভালো হয়ে যাবে—

কল্যাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমি যাবই—আমি কলেজে পড়বই—আমি পাস করবই—

শেষ পর্যন্ত সে কলকাতায় গেল বটে।

পাঁচ

বাস্তবিক কল্যাণীদের বোর্ডিংটা মন্দ নয়—

মিশনারি মেমদের কেয়ারে মস্ত বড় নিরিবিলি বাড়িতে—আলো বাতাস মাঠ খেলা উঁচু উঁচু গাছ ক্রোটন ফার্ণ লতাপাতার ভিতর মন্দ থাকে কি তারা?—বিশেষত বাবা যখন দেড়শো টাকা করে মাসে পাঠান—ছোড়দা যখন সব সময়ই মোতায়েন—গল্পগুজব বন্ধুসংসর্গের আঁটি চুষতে কল্যাণী যখন এত ভালোবাসে।

কিন্তু এবার কলকাতায় এসে প্রথম দিনটা কল্যাণীর খুব কষ্ট লাগল—শালিখবাড়ি ছেড়ে স্টিমারে উঠে অব্দি তার মন চুনমুন করছে—ভালো লাগছে না কিছু—আবার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—বাবা মার জন্য কষ্ট হয়।

স্টিমারে কাঁদল সে।

কিশোর যখন স্টিমারে সেলুনে নিয়ে গিয়ে কল্যাণীকে ডিনার খাওয়াল—নিজে খেলে—তখন মনটা তার কিছুক্ষণের জন্য তাজা হয়ে উঠেছিল—

কিশোর হুইস্কি খেলে— সোডার সঙ্গে মিশিয়ে কল্যাণীকে বললে— দেখ কি খাই

কল্যাণী বললে— ছোড়দা, ছিঃ!

কিশোর বললে—তুই খাবি? খা না—

কল্যাণীকে সোডার গেলাসটা এগিয়ে দিল সে—আধ পেগ আন্দাজ হুইস্কি ঢেলে।

কল্যাণী আগুন হয়ে উঠে বললে—ছোড়দা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! আমাকে তুমি এ সব কি দিচ্ছ!

—খুব ভালো জিনিস

কল্যাণী বললে—আমি নদীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেব

—আহা, তা আর করতে হবে না—আহা হা—

কিশোর এক চুমুকে গেলাসটা ফুরিয়ে ফেলল

কল্যাণী বললে—বাবাকে আমি লিখে দেব

কিশোর বাঁ চোখের ভুরু কুপনের দিকে খানিকটা তুলে নিয়ে বললে—হুম্—দিস্—

কাটলেট চিবুচ্ছিল কিশোর।

—মেজদাকেও লিখব—

শিকেয় তুলে রেখে দে! মেজদা? হুইস্কি না খেয়ে কোর্টে যায় কোনো দিন।

—মেজদা?

—হ্যাঁ তোমার ধর্মদাদা—

—মাইরি বলছ?

—মাইরি বলছি।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—তুই নাই করলি যা—

কিশোর (গেলাসে) আর একটা সোডার বোতল খসাল—

কল্যাণী বললে—ছোড়দা?

কিশোর হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বললে—এটা স্টিমারের সেলুন—এখানে বাবাও নেই—মাও নেই।

কল্যাণী আঘাত পেয়ে বাইরের দিকে তাকাল—অন্ধকার; বর্ষার শেষের খরস্রোতা নদী তিমিরাবৃত হয়ে কোন দিকে চলেছে যে—তার মুখ দেখতেও ভয় করে—স্টিমারের চাকার সেই জলেজলাকার মূর্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভীষণ হাহাকারে হৃদয় এমন বিহ্বল হয়ে ওঠে—নিজেকে এমন নিঃসহায় মনে হয়—

কিন্তু কল্যাণী দেখল ছোড়দার একেবারেই অন্য বরণ; বাইরের দিকে সে তাকাচ্ছেও না, না দেখছে নদীর মুখ, না শুনছে জলের দীর্নবিদীর্ণ রব, না পাচ্ছে মাঠ প্রান্তর আলেয়ার একটুখানি আভাস—বাপ মা ঢের দূরে পড়ে আছে বলে ছোড়দার ভালোই লাগছে। কেন যে এত ভালো লাগে ছোড়দার—কি যে তার প্রফুল্লতা—কোত্থেকে যে সে এত আমোদ পায় এত হৃদয়হীনভাবে ফূর্তি করে, কথা বলে, চীৎকার পাড়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না কল্যাণী। ইলেকট্রিক বাতির নিচে, স্টিমারের সেলুন, হুইস্কি ও চুরুটের মধ্যে ছোড়দাকে যেন একটা বাঁদরের মত দেখাচ্ছে—সে যেন আর মানুষ নয়—মানুষের স্বাভাবিক হারিয়ে ফেলেছে যেন সে—ছোড়দার প্রাণে তাই কোনো ব্যথা নেই—আকুলতা নেই—ভাবনা নেই—স্বপ্ন নেই—নিস্তব্ধতা নেই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী অবলম্বনহীন হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল—

কিশোর বললে—বৃষ্টি পড়ছে না কি?

কল্যাণী বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ

—তোর শীত করছে?

—একটু একটু

কিশোর বললে—তাহ'লে নে—একটু খা

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সোডা হুইস্কি কল্যাণীকে এগিয়ে দিল কিশোর—

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে বললে—আমি না তোমার বোন?

—তাহ'লেই বা

একটু পরে? তুই দেখছি বাবার মত হ'লি কল্যাণী

আরো একটু পরে; বাদলার দিনে একটু আধটু হুইস্কি খাওয়া আমি অপরাধ মনে করি না। আমার বৌকেও আমি খাওয়াব। তুমি বোন-আমার বৌয়ের চেয়েও বেশি কি?

অত্যন্ত কঠিন ক্ষমাহীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণীর দিকে তাকাল কিশোর। তারপর বাকীটুকু গেলাস চুপে চুপে ফুরোল!

কিশোরের শেষ হয়ে গিয়েছিল—

কল্যাণীকে বললে—চল্—একটু নিচে গিয়ে থার্ড ক্লাসের ফ্ল্যাটের থেকে ঘুরে আসি

কল্যাণী বললে—চল

কিশোর চুরুট মুখে দিল, কেবিনে ঢুকে রেন-কোটটা গায় দিয়ে দিয়ে বললে—তুইও কি ম্যাকিনটোশ নিবি?

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বললে—না

—শীত করছিল না?

—এখন আর করছে না।

—বৃষ্টি থেমে গেছে বুঝি—

দু-জনে নিচে গেল

ইতস্ততঃ যথেষ্ট ভিড় ছড়িয়ে রয়েছে—গুদামের আশে পাশে কেরানীবাবুর ঘরের কিনারে—থার্ড ক্লাসের ল্যাবরেটরিগুলোর খানিক তফাতে মেয়ে পুরুষ ছোট ছোট ছেলেপিলেরা বিছানা মাদুর চট শতরঞ্চি পেতে হা করে কল্যাণী আর কিশোরকে দেখছিল

কিশোর বললে—হ্যাংলা যত সব

দু'জন আধবয়সী বৈষ্ণবীকে কল্যাণী বললে—তোমাদের গায় জলের ছাঁট লাগছে যে! তার আপ্যায়িত হয়ে উঠল।

বললে—কি আর করা

কল্যাণী বললে—কোথায় যাচ্ছ

—নবদ্বীপ

—সেইখানে তোমাদের বাড়ি বুঝি?

—না, মা, তীর্থ্যি করতে—

কিশোর বললে—কল্যাণী তুই ট্যালা হয়ে গেলি যে

কল্যাণী বললে—এই যে চেপে জল এল, এইবার বোষ্টমী তোমরা কি করবে—

দু'জন বৈষ্ণবঠাকুর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন—উঠে বসে বললেন—কার আর কি—রাধাবল্লভ যা করেন।

একটা বিড়ি জ্বালিয়ে বললে—রাধাবল্লভ এবার বড় হেনেস্থা করছে, বড় নিদয় এবার ঠাকুর।

বৃষ্টির মধ্যে তারা ভিজতে লাগল!

ক্যাঁক করে একটা শব্দ হ'ল।

কল্যাণী বললে—ও কি ছোড়দা

—আর কি মুরগি জবাই হচ্ছে

প্যানট্রির কাছ দিয়ে যেতে যেতে তারা দেখল গলাকাটা দু'টো মুরগিকে ছাড়ানো হচ্ছে—

কল্যাণী বললে—আহা, এই রকম করে এরা কাটে!

চলতে চলতে কিশোর বললে—এই দেখ হাঁস—মুরগির খাঁচা

কল্যাণী তাকিয়ে দেখল ঃ অন্ধকারে—বাদলায় পাখিগুলো জড়সড় জীবন্মৃত হয়ে পড়ে—ভিজছে পাখিগুলো—

এই নিঃসহায় প্রাণীদের পাশে এসে কল্যাণী বাপ মা বাড়ির কথা ভুলে গেল সব; মনের ভিতর তার কেমন করছিল যেন; অন্ধকার—বৃষ্টি—বাইরের জলের কলরোল—মাঠ—তেপান্তর—পাড়াগাঁ—শ্মশান তার করুণ কল্পনাকে আরো কাতরতর প্রচুর খোরাক যোগাচ্ছিল।

এ রকম সব অভিজ্ঞতা তার জীবনে বড় একটা হয়নি।

এই সবের নতুনতা কল্যাণীকে অভিভূত করে ফেলতে লাগল।

বাংলা বইয়ের পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর বললে—এই ট্যালা, লাল লাল ঝুঁটি বুঝি দেখিসনি কোনো দিন

—কল্যাণীর মুখে কথা জুয়াল না।

কিশোর বললে—চল

কল্যাণী ছোড়দার পিছে পিছে হাঁটতে লাগল—

একটি দাড়িআলা মুসলমান ছুরি দিয়ে আনারস কেটে যাচ্ছিল—সমস্ত বৈষ্ণব পরিবারটা হাপিত্যেশ করে সেই আনারসের দিকে তাকিয়ে—একটি তিন মাসের শিশুকে তার মা মাই দিচ্ছে। শিশুকে একেবারে উলঙ্গ রাখা হয়েছে—সোঁ সোঁ করে বাতাস বৃষ্টি তার কোনো ক্ষতি করছে না কি? নিউমোনিয়া যদি হয়? পাশেই একটা ফর্সা ছিপছিপে হাঁপিকাশের রুগীর বুকের দু' দিকটার দু'টো পাঁজর ঝট্‌পট্ নির্বিবাদে ফ্ল্যাটের যে দিকে খুশি সে দিকে কাশি কফ।

ছয়

কলকাতায় পৌঁছে কল্যাণী বললে—আমি বোর্ডিঙেই যাব, তুমি ছোড়দার

—আমার হোস্টেলে

কল্যাণীকে বোর্ডিঙে রেখে কিশোর চলে গেল।

কল্যাণী স্নান করে খেয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল—

কিন্তু কাঁদলে কি পৃথিবীতে চলে?

কল্যাণীর উঠতে হ'ল।

দু-তিন দিন হ'ল কলেজ খুলেছে—আজো দু-তিন ঘণ্টা ক্লাস হয়ে গেছে—আরো দু-এক ঘণ্টা হবে। কল্যাণী বই গুছিয়ে নিয়ে কলেজে গেল।

কলেজ থেকে ফিরে এসে বুকের ভারটা তার যেন একটু কমেছে মনে হ'ল। নিজের সীটটা ঠিকঠাক পরিষ্কার করে টেবিল গুছিয়ে বই সাজিয়ে বিছানা সাফ ক'রে তারপর কল্যাণী মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে বারান্দায় কম্পাউন্ডে খানিকটা ঘোরাঘুরি হাসি তামাসা করে এল।

কিন্তু মন তার আজ এ সবের ভিতর একটুও নেই যেন—কেবলই শালিখবাড়ির কথা মনে পড়ছে—বাবার কথা, মার কথা; ঘুঘুর ডাককে সে ঠাট্টা করেছিল—কিন্তু আজ হাজার কান পাতলেও সে ডাক আর শোনা যাবে না এ নিষ্ফলতা যেন পাড়াগাঁর কোন্ শান্তশ্রী পল্লীকন্যার মত ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কল্যাণীকে উপহাস করতে লাগল—দু'চোখ তার বেদনার—বিরহের জলে ভরে উঠল।

রাত হয়ে গেছে।

বাবাকে সে চিঠি লিখতে বসল:

তুমি যদি তাই চাও বাবা তা'হলে আবার আমি দেশে ফিরে যেতে পারি। তোমার মনে কষ্ট দেবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই। তুমি ভেবেছ তোমাদের চেয়েও কলকাতার ফাইফুর্তি বুঝি আমি বেশি ভালোবাসি। তা আমি ভালোবাসি না বাবা। তোমাদেরই আমি বেশি ভালোবাসি—ঢের বেশি। কলকাতার ফুর্তির কোনো মূল্য নেই আমার কাছে এখন আর। এ সব আমার আর ভালো লাগে না।

দেশে থাকতে মুখ ফুটে কিছু বলিনি বলে, বাবা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। এই চিঠিতে তো আমি সব লিখছি; সব খুলে লিখলাম। এখন তুমি তোমার মেয়েকে ঠিক করে চিনতে পারবে।

স্টিমারঘাট থেকে সেই যে তুমি চলে গেলে তখন থেকেই আমার এত খারাপ লাগতে লাগল। আমি রেলিঙে ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু স্টিমারটা হঠাৎ কেমন করে যে কোন্ দিকে যে ঘুরে গেল ভিড়ের ভিতর তোমাকে আমি আর দেখতে পেলাম না—দেখতে দেখতে পথঘাট লোকজন কোথায় সব পড়ে রইল—রইল শুধু নদী আর ছোড়দা আর আমি। তখন এমন খারাপ লাগল আমার কি বলব তোমাকে বাবা! অনেকক্ষণ রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর রাত হ'ল।

রোজ রাতে তোমাদের সঙ্গে কত গল্প করতাম—একসঙ্গে খেতে যেতাম—একসঙ্গে ঘুমোতাম। কিন্তু স্টিমারে শুধু একা ছোড়দা—বুঝতে পারলাম বাবা মাকে আমি কত ভালোবাসি—তাদের জায়গা আর কেউ নিতে পারে না; রাত স্টিমারে এত কষ্ট হ'ল।

প্রথম রাতে কল্যাণী এর চেয়ে বেশি কিছু আর লিখতে পারল না।

বাইরে তিরিক্ষে ঝড়বৃষ্টি

জানালা খুলে রাখলে সোঁ সোঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস—জলের ছাঁট—কেমন একটা অভূতপূর্ব স্মৃতি ও চিন্তার কাতরতা।

জানালা বন্ধ করে দিলে সমস্ত নিস্তব্ধ—বিজন; কেমন একটা গুমোট; যেন সমস্ত কিছুর থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে কল্যাণী কোন্ অজানিত অপ্রার্থিত জায়গায় পাষাণরাণী হয়ে বসেছে—

চিঠির প্যাড বন্ধ করে তাড়াতাড়ি টেবিলের এক পাশে সরিয়ে দু-চারখানা বই তার ওপর চাপা দিয়ে রেখে দিল কল্যাণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ঝড়ের জন্য জানালাটা বন্ধ করে ফেলেছিল সে; খুলল আবার।

বাতি নিবিয়ে দিল।

ঘুমিয়ে পড়ল।

পর দিন খুব ভোরের বেলা উঠে কল্যাণী চিঠিখানা শেষ করলঃ

কিন্তু কলকাতায় যখন এসেছি পাস করে যাব না। মানুষকে তো ভগবান সুখের জন্যই তৈরি করেননি শুধু। তোমাদের কাছে থাকলে বেশ শান্তি পেতাম—সুখ পেতাম—কিন্তু তবুও সেটা কুঁদেমি হ'ত; অকর্মণ্যতা হ'ত; মানুষের জীবনের কর্তব্য তাতে পালন করা হ'ত না।

আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বটে, কিন্তু তবুও আমার ঢের করবার জিনিস আছে। প্রথমত আমি লিখতে চাই; পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করতে চাই। তুমি বলেছিলে ডিগ্রি নিয়ে কি হবে? হয়তো ডিগ্রির কোনো মুরোদ নেই। কিন্তু তবুও একটার পর একটা ডিগ্রির জন্য এই যে স্কুল কলেজে বছরের পর বছর পড়তে হয় এ জিনিসটা আমাদের একটা নিয়ম শেখায়, একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসে আমাদের, এই শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের অন্য নানারকম জিনিস শিখিয়ে দেয়—যা হয়তো আমরা অন্য কোনো ভাবে আয়ত্ত করতে পারতাম না।

এই দেখ, আমি যদি কলেজ ছেড়ে দিতাম—তাহ'লে এই নিয়মের ভিতর থাকতাম না আর; তাতে হত কি জান বাবা? সহিষ্ণুতা ও চেষ্টা করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতাম—মন ক্রমে ক্রমে আরাম আয়েসের দিকে চলে যেত। সে রকম মন নিয়ে শুধু শিক্ষাদীক্ষাই নয়—পৃথিবীর কোনো সার জিনিসই লাভ করতে পারতাম না আমি—পারতাম কি বাবা?

সেই জন্যই আমি সঙ্কল্প করেছি যে কলেজের এই রকম সব কঠিন আইন কানুনের ভিতর অনেকদিন থেকে থেকে আমি নিজেকে ঢালাই পিটাই করে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে নেব।

এখানকার ডিগ্রি নিয়ে তারপর আমি বিলেত যাব।

বিলেত থেকে শিখে এসে তারপর এইখানে মস্ত বড় কাজের জায়গা পাওয়া যাবে, নানারকম কাজের কল্পনা আমি ঠিক করে রেখেছি; ক্রমে ক্রমে সেই সবই আমি সফল করে তুলব।

এ না করে আমি ছাড়বই না।

এখন আর আমি দেরীতে উঠি না।

আর কোনো দিন দেরীতে উঠব না।

আজ পাঁচটার সময় উঠেছি—এখন ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বোর্ডিঙের মেয়েদের মধ্যে একজনও ওঠেনি এখন। সবাই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো আটটার সময় উঠবে—আমার এমন হাসি পায়।

দেরীতে উঠে কোনো ফূর্তি পাওয়া যায় না বাবা। তাতে মন খারাপ হয়—তাড়াতাড়ি করে পড়াশুনা, কলেজের তাড়াহুড়োর ভিতর শরীরও খারাপ হয়ে যায়—

আজ সকালটা এমন মিষ্টি।

টেবিলের পাশে জানালাটা খুলে চিঠি লিখছি। আকাশ নীল। লতাপাতা ক্রোটন ঝুমকো পাতাবাহারের ভিতর কত ফড়িং প্রজাপতি টুনটুনি চড়ুই; আমার জানালার পাশে (উইনডোবক্সের ওপর) সাদা লোটন পায়রাগুলো; ডান দিকে মস্ত বড় সেগুন গাছটাকে জড়িয়ে থোকা থোকা হলদে করবী।

কাল রাতে খুব বড় হয়ে গিয়েছিল, আজ ভোরটা বেশ ঠাণ্ডা—শ্বেতপাথরের মত ঠাণ্ডা আর শ্বেতপাথরের মত পরিষ্কার যেন—এই ভোর—এই ভোরের আলো।)

আমার মনে হয় আমার চোখ বেশ ভালো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তবুও এম. এন. মিত্রকে চোখ দেখাব; মেয়েরা বললে ডাক্তার অ্যাট্রোপিন দেবে তুমিও তাই বলেছিলে; অ্যাট্রোপিন দিলে আমাকে অন্ধকারে কয়েক দিন থাকতে হবে। কিন্তু চশমা তাহ'লে বেশ ভালো করে ফিট করবে। আজ ছোড়দা এলে তাকে বলব শনিবার মিঃ মিত্রের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে। শনিবার সকালে ছোড়দার সঙ্গে মিত্রের ইনফারমারিতে যাব। শনি, রবি ও ক'দিন ছুটি আছে—বুধবারও ছুটি আছে; সোম মঙ্গল কলেজ কামাই হবে।

এখন থেকে চোখ সম্বন্ধে খুব সতর্ক হব। মেয়েরা বলে চশমা নেওয়ার পর অনেক সময় চোখ ক্রমে ক্রমে ভালোও হয়ে যায়। শুনে আমার খুব ফূর্তি বোধ হ'ল। মাকে এই কথা বোলো।

থিয়েটারে আমি কোনো দিন যাব না।

পরীক্ষা না দিয়ে বায়োস্কোপেও যাব না।

তুমি যা চাও আমি ঠিক তাই করব।

আমি তোমার লক্ষ্মী মেয়ে হব।

তোমার কল্যাণী।

চিঠিখানা এই রকম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

চশমা বেশ ফিট করেছে—কালো টরটয়েজ শেলের ডাঁট—তেমনি রিম—বড় গোল গোল পাথর—কল্যাণীর রূপ যেন আরো ঢের খুলে গিয়েছে এই চশমার জন্য।

মেয়েরা তার সঙ্গে এখন আরো বেশি খাতির করতে আসে।

অনেক অদ্ভুত—অসার—আজগুবি—অনেক সেন্টিমেন্টাল—নানারকম রস লালসার কথা বলে তাকে—তাকে ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু এবার দেশে গিয়ে কল্যাণী যে একটা গুরুত্ব পেয়ে এসেছে এখনো তা সে খোয়ায়নি।

বাবা দেড়শো টাকা করে মাসে পাঠান।

বিকেলবেলা কিশোর এল, ছোড়দার নাম স্লেটে দেখে কল্যাণী লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে এল।

কিশোর কাশছিল।

কল্যাণী বললে—'এ কি তোমার শরীর খারাপ দেখাচ্ছে যে ছোঁড়দা'

'ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল।'

—আমাকে লেখনি কেন?

—তুমি আমাদের হোস্টেলের ভিজিটিং ডাক্তার, না?

কল্যাণী একটু হেসে বললে—না, জানতাম—

—জেনে কি করতে? টাট্টু প্রিন্সিপ্যালের মত প্রার্থনা করতে, না?

—টাট্টু প্রিন্সিপ্যাল আবার কে? ওঃ তোমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—

কল্যাণী টেনে টেনে একটু হাসল।

বললে—'ছি, টাট্টু বল কেন? প্রিন্সিপ্যাল মানুষ তাকে টাট্টু?

—কলকাতার সকলেই ওকে টাট্টু বলে:

—তাই বলে তুমিও বলবে?

—না, আমার একটা নতুন কিছু বলা দরকার, আমি বলি গিধোর—

কল্যাণী এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইল

কিশোর বললে—গিধোরের মানে জানিস?

—না

—তবে থাক।

কল্যাণী বললে—ইনফ্লুয়েঞ্জা তোমার খুব বেশি হয়েছিল না কি ছোড়দা

—উঃ গা হাত পা এখনও টাটাচ্ছে

—তা হ'লে সারে নি তো—

—আলবৎ সেরেছে—

—কি খাও? দু-একটা দিন ভাত না খেয়ে রুটি খেও অন্তত। দু-এক দিন শুধু ওভালটিন খেয়ে দেখলে পার না? শরীরটা একটু টানলে ভাল হয়।

—এখানে সিগারেট খেতে পারা যাবে?

—না

—কেন? কোনো মেয়ে নেই তো।

—ঐ যে মেট্রন বসে

—পাকামো সব

কিশোর বললে—আমি যাই

—বোসো না।

—বসে কি হবে?

—এরকম কর কেন? আমাকে তুমি বোনের মতই মনে কর না। যেন আমি তোমার কত পর— কি যে!

—স্টিমারের সেই হুইস্কির কথা মনে আছে?

কল্যাণী লাজুক বোধ করল।

—বাবাকে লিখিসনি তো?

—না।

কল্যাণী একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বললে—আর খাওনি তো?

—খেয়েছি

—কোথায়?

—ইম্পিরিয়ালে—

কল্যাণী বিরস মুখে কিশোরের দিকে তাকাল।

কিশোর বললে—বাপ রে, তোকে যে পিসিমার মত দেখাচ্ছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী চুপ করে রইল; ছোড়দার জন্য যতখানি মমতা তার আছে তার সিকির সিকি প্রভাবও এ মানুষটির ওপর তার নেই। নিজে সে কিছু করতে পারে না। কিন্তু সে সঙ্কল্প করল বাবাকে লিখবে।

কল্যাণী বললে—আবারও অপথ্য করলে?

—অপথ্য?

চিমারে করলে—ইম্পিরিয়ালে করলে—না জানি আরো কত জায়গায়—

—ও, —হুইস্কি—হ'ল তোমার অপথ্য। তুমি মার রঙে মন্দ না

—আর খাবে না বল

—পিসিমার মত মুখ করিস না।

কল্যাণী বললে—আমি বাবাকে সব লিখে দেব।

কিশোর বোনের দৃঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা সন্দিগ্ধ হ'ল—

বললে—সত্যি লিখবি—

—নিশ্চয়, আজকের ডাকেই আমি লিখব।

—বাবা বিশ্বাস করবে তোকে?

—আমাকে বিশ্বেস করবেন না তো কি তোমাকে করবেন?

কিশোর তা জানে।

ডেস্কের ওপর থেকে একটা চক কুড়িয়ে নিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বললে—যাঃ, আর খাব না।

—সত্যি?

—পয়সাই বা কোথায় আর?

—না, বল খাবে না আর।

—বললামই তো—

লুকোচুরি কোরো না কিন্তু আমার সঙ্গে

কিশোর একটু অপমানিত বোধ করে ঠোঁট কামড়ে কঠিন হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকাল—

—রাগ কোরো না ছোড়দা, তোমার ভালোর জন্যই বলেছি; চকোলেট খাবে?

—না

—রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি—

কিশোর বললে—তুমি বায়োস্কোপ দেখাও ছেড়ে দিয়েছ না কি কল্যাণী!

ছেড়ে সে দিয়েছেই তো—কিন্তু তবুও ছোড়দাকে খুশি করবার জন্য বললে—তুমি যাবে নাকি?

—আমার পয়সা নেই—তুই যদি পাঁচ টাকা দিতে পারিস তা হ'লে কাল গ্লোবে চল্

কল্যাণী বললে—আচ্ছা

—আর থিয়েটার?

থিয়েটার আমি দেখব না

—কোনো দিনও না?

—না

কিশোর বললে—অবিশ্যি তেমন জোর বই নেই—আর্টিস্টও নেই—বাংলায়। কিন্তু, চল্ না একদিন ইংরেজি থিয়েটার দেখে আসি।

কল্যাণী বললে—বললামই তো যাব না আর আমি

কিশোর জেরা করে বললে—কেন?

—কে আমি জানি না; আমি যাব না।

—ঈস?

—তাহ'লে আমি বায়োস্কোপেও যাব না।

কিশোর বললে—আচ্ছা না গেলি—আড়াইটা টাকা আমাকে দিয়ে দে

কল্যাণী বললে—আচ্ছা নিও

—এখুনি

কল্যাণী টাকা এনে দিল।

কিশোর বললে—এঃ, ঠিক আড়াইটেই এনেছিস যে বড় গুণে গেঁথে—

—তাই তো চেয়েছিলে—

—আচ্ছা বেশ পাঁচটাই দে।

কল্যাণী ঘাড় হেঁট করে ভাবল বাবা ছোড়দাকে যা টাকা পাঠান তার ওপরেও এরকম হাঁকাই কেন—এরকম আগে তো ছিল না—এর মানে কি?—না জানি টাকা কেমন করে রূপান্তরিত হয়ে কি হয়ে যায়

কল্যাণীর মন খোঁচা খেয়ে উঠল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে মুখ তুলে সে বললে—আমি আর দিতে পারব না।

পাঁচটা কেন—দশটা পঁচিশটা—অনেক কিছুই সে দিতে পারত, কিন্তু কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণীর মন সন্দেহে ভ'রে উঠল।

কিশোর বললে—পারবি, পারবি—আর আড়াই টাকা তো মোটে—

কল্যাণী নিজের মনকে বললে—দেওয়া কি উচিত? বাবা কি দিতেন? মা? আমি দেব?

কিশোর বললে—তুই গেলেও আর আড়াইটা টাকা তো লাগত। সেই টাকাটা না হয় আমাকে দিয়ে দিলি—তুই আমাকে দিয়ে দে।

কিশোর একটু কেশে বললে—এতে তোর কি ক্ষতি হবে কল্যাণী?

—থাক, আর বোলো না দাদা।

একটা দশ টাকার নোট এনে কিশোরকে সে দিল।

আট

কিন্তু এবার বাড়ির থেকে যে একটা সঙ্কল্প ও মর্যাদা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল কল্যাণী বেশি দিন আর তা টিকল না।

ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে সে একদিন বায়োস্কোপ দেখতে গেল—

এর ভিতর কোনো অপরাধ ছিল না অবিশ্যি।

কিন্তু তবুও প্রতিজ্ঞা তো করা হয়েছিল—বাবার কাছে প্রতি চিঠিতেই কত প্রতিজ্ঞা জানিয়েছে কল্যাণী—সে কার্নিভালে আর যাবে না, লাকি সেভেন খেলবে না, সার্কাস দেখবে না, বায়োস্কোপেও যাবে না—

প্রতিজ্ঞা যখন ভাঙল বাবাকে আর লিখল না; অবহেলা ক্রমে ক্রমে আরো বেড়ে উঠল—আয়েস বাড়ল, আবার সেই আগের আরাম ফিরে এল। আটটা সাড়ে আটটার সময় ঘুম থেকে উঠে জীবনটাকে তার ভালো লাগতে লাগল।

বেশ চলেছে।

আর একদিন বায়োস্কোপ দেখতে গেল সে; হাফ টাইমের সময় আইসক্রিম খেলে—ছবি কিনলে—মেয়েরা সোডা ফাউন্টেন থেকে ঘুরে এল—কল্যাণীও গেল।

এই সব নির্দোষ আমোদ, কোনো গ্লানি নেই এ সবের ভিতর। কিন্তু আরাম রয়েছে।

কল্যাণীর জীবন তাহ'লে আরামের দিকে মোড় নিল আবার? এক প্রসাদ ছাড়া এরা সকলেই এই রকম—অনেক কিছুই আরম্ভ করতে পারে—কিন্তু কোনো কিছুতেই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে দাঁড় করাবার মত অপরিসীম আত্মখুটেপনার গৌরব এদের চরিত্রের মধ্যে নেই—

কিশোর একদিন কল্যাণীকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইল—

বললে—ভাদুড়ীর প্লে তুই কোনোদিন দেখিসনি কল্যাণী

—দেখিনি তো—

—তাহ'লে কি নিয়ে তুই বড়াই করবি।

কল্যাণী একটু বিস্মিত হয়ে বললে—তার মানে?

—লোকে তোকে ঠাট্টা করে ধুনে দেবে যে—

—কেউ ঠাট্টা করে না

—এখন করে না; আছিস তো কতকগুলো খাজা মেয়ের মধ্যে। কিন্তু যখন বড় হবি—বিয়ে করবি—সোসাইটিতে ফিরবি—তখন চোখের মাথা খেয়ে বড্ড লজ্জা পেতে হবে তোর—

কল্যাণী এ লজ্জাকে এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না। থিয়েটারে যাবার তার একটুও ইচ্ছা ছিল না।

কিশোর বললে—এবার আমাদের বাঙালিদের স্টেজটা ভালো হয়েছে—

স্টেজের জন্য বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না কল্যাণীর—সে চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

কিশোর গম্ভীর হয়ে উঠল।

বললে—কল্যাণী, ও রকম অবহেলা কোরো না।

কল্যাণী ছোড়দার দিকে তাকাল—

কিশোর বললে—শুধু তো নাচ গান দেখতে যাওয়া নয়—ফূর্তি তামাসা নয় শুধু। আর্ট আলাদা জিনিস।

আর্টের সম্বন্ধে কল্যাণীর বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। আর্ট তাকে কোনো দিন বড় বেশি উৎসুক করেনি—উত্তেজিত করা তো দূরের কথা।

কিশোর বললে—না যাত্রা—ফাত্রা নয় আর, এ দস্তুর মত প্লে—

কল্যাণী একটু বিস্মিত হয়ে বললে—প্লে?

—প্লে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর বললে—যত গাজন পাঁচালী ঢপ কথকতা যাতা শালিখবাড়িতে শুনেছ—কলকাতার থিয়েটারেও সেই সবেরই কপচানি দেখেছ এদ্দিন, কিন্তু এখন একেবারে আলাদা জিনিস দেখবে।

কল্যাণীর একটু কৌতূহল হ'ল, ভাবলে ঃ না জানি কেমন!

বললে-সত্যি ছোড়দা?

—আমার সঙ্গে এসো—দেখো—তারপর বোলো

কিশোর একটু কেশে বললে—তারপর বোলো চিরদিন মনে থাকবে কিনা—

—সত্যি?

—তা যদি না থাকে তাহ'লে আর্ট হয়?

—ওঃ বুঝেছি—

কিশোর বললে—কবিতা গল্প কত জায়গায় তো আর্টের পরিচয় পেয়েছ—

কল্যাণীর স্পষ্ট কিছু মনে পড়ছিল না।

কিশোর বললে—ছবিতেও

বিশেষ কোনো ছবি—কোনো ছবিই মনে পড়েছিল না কল্যাণীর।

কিশোর বললে—মানুষের মুখে কিম্বা পাথরের মূর্তিতেও

কল্যাণী গালে হাত দিয়ে ছোড়দার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিশোর বললে—গানে বাজনায়।

একটু কেশে বললে—এবার স্টেজে দেখবে।

দু'জনে গেল—থিয়েটার দেখতে।

থিয়েটারের থেকে ফিরবার সময় কিশোর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলে।

ট্যাক্সিতে চেপে কল্যাণী বললে—রাত হয়ে গেছে

কিশোর বললে—বেশি না হুঁ।

—ক'টা?

—একটা দু'টো হবে।

কল্যাণী ভয় পেয়ে বললে—কি হবে তাহ'লে?

—কেন?

—বোর্ডিঙে যেতে পারব না তো এখন।

কিশোর হো হো করে হেসে উঠে বললে—সেই জন্য তোমার ভাবনা?

—ভাবনা নয় ছোড়দা?

—ভাবনা আবার! এই নিয়ে ভাবনা? এই সেথো জিনিস নিয়ে? বলতে বলতে কিশোর একটা স্টলের দিকে গেল।

কল্যাণীর বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করতে লাগল।

কিশোর পান সিগারেট কিনে এনে গাড়িতে এসে বসল; বোনের চোখের ছটফটানির দিকে তাকিয়ে বললে—ছিঃ এ কি রকম?

—কি হবে ছোড়দা?

কল্যাণীর হাত ধরে কিশোর বললে—আমি আছি না?

—তুমি তো আছ—

—তবে?

—বোর্ডিঙে যেতে পারব না যে

কিশোর বললে—এই তো থিয়েটার থেকে বেরুলে, বোর্ডিঙের ভাবনা ছাড়া তোমার মাথায় আর কিছুই কি নেই?

—এত রাতে কোথায় যাব আমরা?

—বলি, এরকম চিন্তাভাবনা ছাড়া তোমার হৃদয়ের মধ্যে আর কিছুই কি নেই?

কল্যাণী বললে—না

কিশোর অত্যন্ত নিরাশ হ'ল।

খানিকক্ষণ সিগারেট টেনে বললে—একটা নতুন কিছু দেখেছ—অজন্তার গুহায় ঢুকলে বা ইটালীর মাস্টারদের ছবি প্রথম দেখলে বা জার্মান মাস্টারদের মিউজিক প্রথম শুনলে বা কাউকে প্রথম ভালোবাসলে মন যেমন করে ওঠে—কেমন নাড়াচাড়া ফেরে তেমন কিছুই কি তোমার হয়নি কল্যাণী?

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বললে—না

তা যাই বলুক ছোড়দা কিশোরের আজকের রাতের এই পৃথিবী থেকে কল্যাণী ঢের দূরে—কিশোরকে তার এমন অস্পষ্ট অসংযত নির্মম মনে হতে লাগল—এমন হৃদয়হীন হয়ে গেছে ছোড়দা—এমন অর্থহীন—

কিশোর বললে—এমন অদ্ভুত তুমি—এখন অদ্ভুত—অদ্ভুত—আজগুবির এক শেষ

কল্যাণী বললে—কোথায় চলেছ?

—যেখানে খুসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেছল—তার নিজের সহোদর বোনটা এমন ভীরু—এমন ভোঁদা—একটা মাংসপিণ্ড যেন—কেমন একটা আর্টের পৃথিবীর থেকে ফিরে এসে নট নিয়ে কথা নয়, নটী নিয়ে কথা নয়,গান কবিতা কুশলতা, প্রাণ, রস, আবেগ, সংযম, সীমা অনুভব, বেদনা কিছু নিয়ে নয়—এমন কি থিয়েটারের ঘট ঘট ফাইফুর্তি নিয়েও নয়—শুধু কোথায় চলেছ, কত রাত হয়েছে, বোর্ডিঙে যাব কি করে!

অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল কিশোরের মন।

কল্যাণী বললে—ট্যাক্সি চলেছে তো চলেইছে—

—বেশ করেছে—

—আর কত দূর যাবে?

কিশোর কোনো জবাব দিল না।

নীরবে সিগারেট টানতে টানতে সে তার নট-নটীদের কথা ভাবছিল—ভাবছিল এক দিন সেও হয়তো স্টেজে দাঁড়িয়ে অমন অভিনয় করবে—আরো রূপান্তর আনবে সে—আরো স্থির—আরো অবিকৃত প্রতিভা—(মুখোস একেবারে দেবে বদলে)—

কিশোর ভাবছিল—বিলেত যদি হ'ত—

কল্যাণী আতঙ্কিত হয়ে বললে—এ কি গঙ্গা নয়?

কিশোর টিটকারি দিয়ে বললে—গঙ্গাকে চেন কি তুমি? কল্যাণী?

কল্যাণী অভিমানক্ষুব্ধ ছোড়দার দিকে তাকাল—

কিশোর বললে—একটা নদী দেখেও তোমার মনের উৎকণ্ঠা ফুরোয় না? যেন আরো বাড়ে। ভালোবেসে তুমি এর দিকে তাকাতে পার না? এ কেমন?

কল্যাণী বললে—রাত যে ঢের হয়ে গেছে ছোড়দা।

—হ'লই বা। তাতে কি নদী মরুভূমি হয়ে গেল? তোমাদের মেয়েদের ঐ বড় দোষ। মনের মুদ্রাদোষ কিছুতেই ছাড়াতে পার না তোমরা। চলতি পথের থেকে এক চুল চুমরে পড়লে সবই যেন গ্লানি—ব্যথা—ভয়—কত কি? মেয়েরা জীবনটাকে তাই বোঝে না। পর পর বিস্ময় চমক ও নতুনত্ব নিয়ে যে জীবন মেয়েরা তাতে কেমন যে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে—জীবনটাকে তোমরা অশ্রদ্ধা কর—এই নদীটাকেও তুমি আজ শ্রদ্ধা দিতে পারলে না। আমার কাছে এমন চমৎকার মনে হচ্ছে—অথচ তোমার কাছে এই গঙ্গা একটা কেঁদো জানোয়ার যদি না হয় প্রাণপণে এটা হিংসে করছ তুমি; না কল্যাণী?

কল্যাণীর মনে হ'ল ছোড়দা আজও হয়তো ঢের হুইস্কি খেয়েছে। কিন্তু কোনো রকম হুইস্কি খায়নি কিশোর আজ।

সে খুব সরল মনে কথা বলছিল—অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে; তার বাক্যের চিত্তবৃত্তি তার সমস্ত প্রাণকে ভরে ফেলেছে যেন আজ; দিনরাত্রির মাঝখানের এমন বিস্ময়কর সময়ের গঙ্গাটাকে সে খুব হৃদয় দিয়ে উপভোগ করছিল—

শেষ রাত্রের বাতাস ভালো লাগছিল। অনেকক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

নয়

কল্যাণী ঘুমিয়ে পড়েছে; ড্রাইভার ঘুমিয়েছে।

ভোরবেলা কল্যাণী বোর্ডিঙে পৌঁছে যেন নতুন জীবন পেল।

থিয়েটারের শেষ গ্লানি ঝেড়ে ফেলে, ভদ্রসভ্র মেয়েদের মধ্যে ঢের ভদ্র হয়ে, মেট্রনের সুনজরের শুভ্রতা বোধ করে, ঘাড় গুঁজে হিস্ট্রির নোট টুকতে টুকতে।

পরদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর জানালার ভিতর দিয়ে গাছপালা আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্যাণীর মনে হ'ল ছোড়দার সঙ্গে থিয়েটারে গেলে এবার আর সে নার্ভাস হয়ে পড়বে না—ভালো করে দেখতে শুনতে পারবে সব। ফূর্তি করতে পারবে—গভীর রাতে ট্যাক্সিতে কলকাতার পথেঘাটে এবার আর সে একটুও সঙ্কোচ বোধ করবে না—গঙ্গা দেখেছি, কেমন ভড়কে ভয় পেয়ে গেছল সে কাল—নদীটা কেমন সুন্দর ছিল অথচ-আজ যেন সে রূপ চুপে চুপে ধরা পড়ছে সব—সেই তিনটে আন্দাজ রাত—মোটর—

—ছোড়দা—মিষ্টি বাতাস—গঙ্গাটা—

কিন্তু এ সবের ভিতর এমন বেকুবি করেছিল কেন সে কাল? বেকুব আর সে হবে না।

মিনু এল।

বললে—কি ভাবছিস?

—পড়ছি

—কি পড়ছিস?

—লজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হাতী! আধঘণ্টা ধরে জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে—
মিনু থামল।
মেট্রন একটু দেখেশুনে ঘুরে গেল।
কল্যাণী বললে—মিনু বোস—
বসল মেয়েটি।
কল্যাণী বললে—একটা কথা কারুর কাছে বলবি না মিনু?
—কি কথা?
—বল বলবি না।
মিনু কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বললে—না।
—কাল থিয়েটারে গিয়েছিলাম
—সত্যি?
কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ
—কার সঙ্গে!
—ছোড়দার সঙ্গে।
—কোন থিয়েটারে?
—নাম মনে নেই
—বেশ তো।
মিনু বললে—কেমন লাগল?
—কি যেন
—কি যেন কি আবার?
মিনু বললে—কোথায় বসেছিলি?
—বক্সে
—ঈস!
—আমি আগেও থিয়েটার দেখেছি। দেখা কি খারাপ?
—জানি না।
—তুই দেখিসনি?
—না
—কোনোদিনও না?
মিনু মাথা নেড়ে বললে—না; দেখবও না।
—কেন?
মিনু বললে—কি দেখে ছাই—আমার কোনো টেস্ট নেই
কল্যাণী বললে—আমারও বোধ হয় টেস্ট নেই
—তা হ'লে গিয়েছিলে কেন?
কল্যাণী বললে—তাই তো।
—আর যাবে?
—কি করতে যাব আর?
তোমার দাদাও তো বড় মজার লোক
—কেন?
—ছোট বোনকে থিয়েটারে নিয়ে যায়?
কল্যাণী একটু আঘাত পেল—
বললে—ছোড়দার ওদিকে বড্ড ঝোঁক কিনা—
বলতে বলতে থেমে গেল সে, থিয়েটারের দিকে ঝোঁক? কেমন শোনায়? কল্যাণী লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল।
দু'জনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।
মিনু বললে—আমি যাই
—কেন?
—পড় তুমি।
—ছাই পড়ছি।
কল্যাণী বললে—এই দেখ বই বন্ধ করলাম।
লজিকের বইটা কল্যাণী বুজে সরিয়ে রেখে দিল—
মিনু বললে—পড়বে না আজ আর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না

—তুমি?

—আমিও না।

—আমার চোখ কড় কড় করে বেশি পড়লে—

মিনু বললে—কিন্তু চশমা নিয়ে তোমাকে বেশ মানিয়েছে—

—সত্যি?

—বেশ সুন্দর দেখায়

—সত্যি মিনু?

মিনু বললে—এই টিকলো নাক কার কাছ থেকে পেয়েছিস—তোর মার কাছ থেকে?

—বাবার কাছ থেকে

—এই চোখ?

—বাবার কাছ থেকে

—এমন সুন্দর থুৎনি?

—বাবার কাছ থেকে

মিনু ক্লান্ত হয়ে উঠছিল—

এ সব প্রশ্নের গুখখুরি বুঝলে সে। কাজেই কথা আর নয়—কল্যাণীর মুখের অনুপম রূপসৃষ্টির দিকে তাকিয়েই রইল সে।

কল্যাণীর নিঃশ্বাসের থেকেও কেমন যেন মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।

মিনু বললে—কি খেয়েছিস রে?

—কখন?

—মুখের থেকে তোর কিসের গন্ধ আসে?

—জানি না তো

—জানিস না? সব সময়ই আমি পাই

কল্যাণী বললে—কিসের গন্ধ রে মিনু?

মিনু কোনো জবাব দিল না; সৌন্দর্যের রসের থেকেই এ যেন এক ঘ্রাণ; পদ্মের রক্তমাংসের থেকে যেমন গভীর বিলাসের গন্ধ আসে তেমন, পদ্ম কি কিছু খায়?

—একটা চুমো খাই কল্যাণী?

চুমো সে খেল—

এমন পরিতৃপ্তি মিনু কোনো দিনও পায়নি যেন।

দশ

পরদিন অন্যরকম ব্যাপার।

রাত দশটা আন্দাজ হবে; কল্যাণীর টেবিলের পাশে পাঁচ ছয় জন মেয়ে এসে জড় হয়েছে।

কল্যাণী বললে—উঃ, কী ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে

মিনু বললে—পড়বে না, এখনো তো ভাদ্র মাস—

কমিশনারের মেয়ে চিতু বললে—তোমরা কি যে বল ভাদ্র মাস না কি মাস তাই বৃষ্টি পড়ছে—অন্য মাস হলে পড়বে না—এ আমি মানি না। মাসের সঙ্গে বৃষ্টির কি সম্পর্ক?

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

বাস্তবিক চিতু কিছু জানে না; কেবল কাঁটা ছুরি দিয়ে খট খট করে খাওয়া আর ইংরেজি গান গাওয়া ছাড়া।

চিতু একটু দমে গেল।

বললে—তোমরা হাসলে যে

মীরা বললে—হাসব না? শ্রাবণ ভদ্র মাসে ঝড় বাদলা হবে—এ তো সকলেই জানে

চিতু বললে—কেন তা হবে? অন্য মাসে কেন হবে না? এটা তোমাদের গ্রেজুডিস্

মিনু বললে—অন্য মাসে বড় একটা হয় তো না দেখি

—খুব হয়, নভেম্বর মাসে বৃষ্টি পড়ে না ডিসেম্বরে পড়ে না?

আবার সকলে হেসে উঠল।

চিতুর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল; অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে সে সংযত করে রাখল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মোটে

চেঁচিয়ে উঠে বললে—কথায় কথায় তোমাদের giggling; গা জ্বলে যায়; ঝড়বৃষ্টি কি তোমাদের বাপের চাকর দারোয়ান যে নভেম্বরে পড়বে ডিসেম্বরে পড়বে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীরা বললে—শোন চিতু

চিতু মীরার ঘাড়ে হাত রেখে বললে—বল ভাই মীরা—তুমি তবু বরং একটু truthfully কথা বলতে পারে–peacefully;

মীরা বললে—তুমি বাংলা মাসের নামগুলো জান তো চিতু

চিতু বললে—না

একটু থেমে বললে—দু'একটা জানি—এই ভাদ্র—

আর কোনো নাম তার মনে এল না।

চিতু বললে—বাংলা মাসের নাম জানতে আমি কেয়ার করি না—

মীরা মাসের নামগুলো আওড়ালে

চিতু বললে—অত আমার মনে থাকবে না

কল্যাণী বললে—লিখে নাও

চিতু বললে—বয়ে গেছে আমার—

মিনু বললে—ক'টা ঋতু তা জান?

—ঋতু আবার কি?

মীরা বললে—যেমন autumn—

—ওঃ, খুব জানি –seasons—

—বাংলায়ও তেমনি রয়েছে—

চিতু বললে—ইংরেজির থেকে নকল?

মিনু বললে—দূর!

চিতুর চোখ গরম হয়ে উঠল।

মীরা বললে—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এ দু'মাস গরম, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষ, ভাদ্র—আশ্বিন শরৎ—

চিতু বললে—শরৎ?

—শরৎ

মীরা বললে—কার্তিক—অঘ্রাণ হেমন্ত, পৌষ-মাঘ শীত—

—মানে, ডিসেম্বরে?

—ফাল্গুন—চোত বসন্ত; বুঝলে চিতু।

চিতু বললে—তা কি কখনো হয়? বাংলা মাসের সঙ্গে শীত বা ইয়ে বৃষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই।

বাঙালিদের মধ্যে দু'একজন তো শুধু আই-সি-এস পাস করে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার হতে পারে—সাহেবদের সকলেই Administrator ওদেরই সব জিনিসগুলো ঠিক; বলে black in November, নভেম্বর এলেই শীত।

সকলে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল।

কল্যাণীর আরসীর পাশে গিয়ে মিনু বেণী বাঁধতে লাগল।

কলেজে প্রফেসরদের কথা উঠল।

মিনু চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে—আমাদের মেয়েদের কলেজে পুরুষ প্রফেসর বড় একটা থাকে না; তাতে লেকচার খারাপ হয়ে যায়—মেয়েরা কি লেকচার দেবে? জানে কি মেয়েরা?

মীরা বললে—তুমি নিজে মেয়ে নও?

মিনু আরসীর দিকে তাকিয়ে বললে—হলামই বা

কল্যাণী বললে—মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার এত হীন ধারণা মিনু—

মিনু বললে—কিছু জানে না মেয়েরা, যা জানে তাও ফুটিয়ে বলতে পারে না। লেকচার যা ধার করে শুধু

চিতু বললে—আমি তা মানব না—মেমসাহেবরা চমৎকার ইংরেজি পড়ান—এর চেয়ে ভালো প্রফেসর কলকাতার কোনো কলেজে তুমি পাবে না—

মিনু বললে—হ্যাঁ! বললেই হ'ল কলকাতার কোনো কলেজে পাবে না—বাইবেল মুখস্থ করলে আর প্রনানসিয়েশন জানলেই হয়ে যায় না, সাহিত্য ঢের গভীর জিনিস—

মীরা বললে—তা ঠিক—সাহিত্য—

চিতু বললে—পাকামো যত সব। সাহিত্যের মানে আমি জানি না বুঝি? তোমরা কেউ বলতে পার এখন পোয়েট লরিয়েট কে?

কেউ বলতে পারল না

চিতু বললে—বরার্ট ব্রিজেস

সুপ্রভা বললে—মেসফিল্ড—

চিতু বললে—তুমি ছাই জান!

সুপ্রভা বললে সেমফিল্ড— আমি জানি।

চিতু বললে—যা জান না তা নিয়ে কথা বল কেন? রবার্ট ব্রিজেস পৃথিবীর সব চেয়ে (বড়) কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনু বললে—তা হোক গিয়ে; আমরা বলছিলাম কলেজের লেকচারের কথা—তার সঙ্গে ব্রিজেসের কি সম্পর্ক?

চিতু বললে—খুব সম্পর্ক। তোমরা সাহিত্য সাহিত্য কর, সাহিত্য তোমাদের চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি। প্রনানসিয়েশনই হচ্ছে সাহিত্যের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। বাঙালি প্রফেসররা না জানে প্রনাউনস্ করতে—না জানে গ্রামার—তারা আবার লেকচার দেবে কি?

কেউ কিছু বললে না।

মিনু বললে—হিস্ট্রির প্রফেসরটি চমৎকার পড়ান কিন্তু মীরা

—কোন জন?

—ঐ যিনি নতুন এসেছেন—মিঃ গাঙ্গুলি—

মিনু বললে—আওয়াজ গুম গুম্ করতে থাকে—মেমদের মত মেয়েদের মত পিন পিন করে না।

মীরা বলল—বেশ ইন্টারেস্টিং করতে পারেন।

মিনু বললে—আঃ, রোমান এম্পায়ারের কথা যা বললেন—শুনতে শুনতে গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে—মনে হয় যেন টাইবারের পারে সেই ইটার্ণাল সিটিতে আবার চলে গেছি

চিতু হাঃ হাঃ করে করতালি দিয়ে হেসে উঠে বললে—মিনু একেবারে পিক-মি-আপ

সুপ্রভা বললে—টপিঙ

চিতু বললে—দুঃখের বিষয় আমি হিস্ট্রি নেই নি, না হ'লেও গাঙ্গুলির বাচ্চার গ্রামার প্রনানসিয়েশন নিয়ে কড়কে দিতাম

—কি করতে

I have corked him

চিতুর কথায় কোনো কান না দিয়ে মিনু বললে—এক এক সময় মনে হয় যেন উনি একজন সেক্রেটরিয়েন—প্রিফেক্ট—সিনেটর...আঃ পম্পির ওপর কি লেকচারটা দিলেন—

মীরা বললে—ভালোবেসেছিস নাকি

চিতু বললে—নিশ্চয় ওঃ ভীষণ এনার্মার্ড!

কল্যাণী বললে—তাহ'লে বিয়ে করলেই পার মিনু

—কাকে গাঙ্গুলিকে?

কল্যাণী বললে—হ্যাঁ, দেখতেও বেশ সুন্দর—অল্প বয়েস

মীরা বললে—বয়ে গেছে গাঙ্গুলির মিনুকে বিয়ে করতে—তার চেয়ে কল্যাণী যদি একটু বেচারাকে ভরসা দেয়।

সুপ্রভা বললে—কল্যাণীই তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর

মিনু বললে—কলেজের বিউটি

মীরা বললে—গাঙ্গুলিকে বলে এক্ষুণি

কল্যাণী বললে—আমার বয়ে গেছে—

মিনু আহত হয়ে বললে—কেন?

কল্যাণী বললে—টিচার বিয়ে করব আমি? আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—এমন দেমাক কল্যাণীর পক্ষে হয়তো সাজে—খুবই সাজে বটে, তাই তো সে কেন একজন টিচারকে বিয়ে করতে যাবে?

মেয়ে কটি এই কথাই ভাবছিল—

প্রথম কথা বললে মিনু; মনটা তার কেমন একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল, মনে হচ্ছিল এক জন যোগ্য লোককে সেধে সেধে অপমান করা হ'ল—

মিনু বললে—আচ্ছা ভাই সুপ্রভা; তুমি তো খুব ভালো ইংরেজি জান—কলেজের প্রফেসরকে টিচার ব'লে না কি আবার?

সুপ্রভা ঘোষাল চোখের থেকে চশমা নামিয়ে আস্তে আস্তে মুছে নিচ্ছিল।

মিনু বললে— এই যে কল্যাণী বললে 'টিচার বিয়ে করব আমি?'— একজন কলেজের প্রফেসরকে কেউ আবার টিচার ব'লে নাকি?

সুপ্রভা বললে—তা বলতে পারা যায়

মীরা বললে—টিচার তো স্কুলের—

মিনু বললে—আমিও তো তাই জানি

সুপ্রভা বললে—টিচার শব্দের নানারকম মানে হতে পারে। স্কুলের মাস্টার তো দূরের কথা কলেজের প্রফেসরের চেয়েও এই শব্দটির জায়গায় ঢের বেশি মর্যাদা—যেমন টলস্টয় একজন টিচার ছিলেন—

সকলেই নীরব হয়ে রইল

চিতু বললে—টিচার বিয়ে করবে না তুমি কল্যাণী?

—আমি বলেছিই তো করব না।

—কেন প্রফেসরদের মধ্যে বড় বড় তো ঢের আছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তা থাক গে

চিতু বললে—গভর্নমেন্ট কলেজের ইম্পিরিয়াল গ্রেডের প্রফেসর হলেও করবে না?

কল্যাণী বললে—না।

চিতু বললে—আমি তো করি—

সকলে অবাক হয়ে বললে—প্রসেফর বিয়ে কর তুমি চিতু?

—আই-ই-এস হলে কেন করব না?

—ওঃ আই-ই-এস!

চিতু বললে—তবে কি? একটা প্রাইভেট কলেজের বরখুটেকে তাই বলে করছি না।

ওরা খেতে পায় নাকি? ছেলেরা ওদের মাস্টারমশায় বলে।

কল্যাণী বললে—মিনুর প্রফেসর হলেই হয়—

মীরা বললে—মন্দ কি? আমারও একজন হলেই হয়—

চিতু বললে—গাঙ্গুলির মতন?

মীরা বললে—হ্যাঁ—খু-ব।

মিনু বললে—বসে আছে।

চিতু বললে—আর সুপ্রভার?

—আমি বিয়ে করব না।

—কি করবে?

সুপ্রভা দেখতে সুন্দর ছিল; খুব স্মার্ট; পড়াশুনায়ও সকলের চেয়ে সেরা।

সুপ্রভা বললে—পাস করব। পাস করে চাকরি ফাকরি নেব না আর। মেজদির ওখানে গিয়ে কাটাব—নইনীতালে—পাইন বনের বাতাসের মধ্যে।

সকলের বিমুগ্ধ হ'ল।

চিতু বললে—তোমার মেজদির বর সেখানে থাকেন বুঝি?

—হ্যাঁ

—কি করেন?

কল্যাণী বললে—আমারও ওইরকম একটা কিছু করতে হবে।

মিনু বললে—ওতে নমুষ্যত্ব থাকে না।

কল্যাণী বললে—কেন?

মিনু বললে—হয়ে স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়—না হয় নিজে করে খেতে হয়—

মীরা বললে—তা ঠিক

জিনিসটা কল্যাণীর মনে খুব গভীরভাবে দেগে গেল।

এগারো

পূজোর ছুটিতে কিশোরের সঙ্গে দেশে চলে গেল কল্যাণী। সকালবেলা শালিখবাড়িতে স্টিমার গিয়ে পৌছুল। কল্যাণীদের নেবার জন্য পঙ্কজবাবু গাড়ি করে স্টেশনে এসেছিলেন।

বাড়িতে পৌছে কল্যাণী দেখল দোতলার হলে একটি অদ্ভুত মানুষ বসে রয়েছে; অদ্ভুত ঠিক নয়. অদ্ভুত বলা চলে না; কিন্তু তবুও কল্যাণীর বার বার মনে হতে লাগল কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত এই মানুষটি—

লোকটি বেঁটেও নয়—লম্বাও নয়; কুঁজো মাথার চুল পাৎলা হয়ে সামনে দিয়ে বেশ বড় টাক পড়ে গেছে; মুখ হলদে—কেমন চীনেদের মত যেন; মুখের ছাঁদও একেবারে চীনেদের মত। হঠাৎ দেখে কল্যাণী আঁৎকে উঠল—এমন খারাপ লাগল তার। কিন্তু তবুও ঠিক চীনে নয় যে—বাঙালি যে তা বোঝা যায়। মুখের ওপর পাঁচ ছয়টা আঁচিলের ভিতর থেকে দাড়ির মত লম্বা লম্বা চুল বেরিয়ে পড়েছে; লোকটা সেগুলোকে কাটেও না ছাঁটেও না। একটা সুট পরে বসে আছে সে। টাই ধরে নাড়ছিল। সামনে টেবিলের ওপর একখানা খবরের কাগজ মেলা। কল্যাণীকে দেখে খবরের কাগজ থেকে চোখ তুললে সে।

আর শিগগির সে চোখ ফেরাল না।

এমন আবিষ্ট হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে রইল। কল্যাণী ভয় পেল। লোকটার ওপর কেমন অশ্রদ্ধায় ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠল তার। হলের থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই এই মানুষটিকে ভুলে গেল কল্যাণী।

গুণময়ী ঘোষ লেবু দিয়ে বেলের সরবৎ করে এনে দিলেন কল্যাণীকে—কল্যাণী খেতে খেতে বললে—আমি স্নান করে আসি গে

গেলাসটা সে টেবিলের ওপর রাখল

—এ কি এক চুমুক খেলি শুধু যে—সমস্তটুকু খেয়ে নে

—থাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কেন? ভালো লাগে না?

—লাগে বেশ

—তবে?

—আমি ভেবেছিলাম, মা, যে চা খাব—

—তা খাস্

—তুমি বেল দিলে যে?

—বেলও হবে, চাও হবে

কল্যাণী হেসে বললে—তা হয় না।

কল্যাণী গেলাসটা তুলে নিয়ে পানটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল—

গুণময়ী বললেন—এত সাধের করা বেল—

কল্যাণী ফেলতে ফেলতে থেমে গিয়ে গেলাসটা টেবিলের ওপর রাখল—

বললে—কে খাবে?

—থাক; কেউ যদি খায়।

স্নান করে কল্যাণী তেতলার বারান্দায় গিয়ে বসল ইজি চেয়ারে। বেশ লাগছিল। পূজোর ছুটিটাই সবচেয়ে ভালো লাগে তার। বেশিদিন দেশে পড়ে থাকতে হয় না। যে ক'টা দিন থাকা যায় সেও বেশ ফুর্তিতেই থাকাই।

খানিকক্ষণ পরে।

একটা বই আনবার জন্য দোতলায় নেমে গেল কল্যাণী; হলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আবার সেই লোকটির সঙ্গে দেখা। এর কথা এক মুহূর্ত আগেও মনে ছিল না, কাগজের থেকে মুখ তুলে কল্যাণীর দিকে আবার সে আবিষ্টের মত তাকিয়ে রইল।

কল্যাণী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে লোকটিকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে এরকম করে তাকানো তার উচিত নয়—এ নিতান্তই অসভ্যতা তার।

সে তা বুঝল কি না কে জানে!

এবারও মুহূর্তের মধ্যেই এ মানুষটির কথা কল্যাণী একেবারেই ভুলে গেল।

একটা বই বেছে নিয়ে তেতলার বারান্দায় গিয়ে ইজি চেয়ারে ঠেসে বসল সে। বইটা; বার্নাড শ'র Intelligent Woman's Pride–

কলকাতার থেকে আসবার সময় মিনু গছিয়ে দিয়েছে। মিনুর বই।

বলেছে ঃ পড়ে দেখিস।

সুপ্রভা দিয়েছে রেড লিলি; মীরা—তার নিজের বাংলা কবিতার খাতা; চিতু—অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড; এর চেয়ে চমৎকার বই পৃথিবীতে আর নেই; নাকি কমিশনার সাহেব বলেছেন; কল্যাণীর হাসি পেল—হোক না ডিভিশনের কমিশনার—

তাই বলেও বইয়েরও কমিশনার?

অ্যালিস অবিশ্যি পড়ে দেখবে কল্যাণী—

কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার বই? তা কক্ষণো হ'তে পারে না। পৃথিবীর ? পৃথিবীর!

পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার বই কি?

জানে না কল্যাণী।

বই সে এত কম পড়েছে!

কল্যাণীর মনে হ'ল কোনো একখানা বইকে সবচেয়ে বড়—সবচেয়ে ভাল—এ রকম বলতে পারা যায় না।

লোকে বাংলা বইগুলোকে এত অগ্রাহ্য করে কেন?

কলেজের মেয়েরাও

বাঙালিদের মধ্যে কি লেখক নেই?

তেমন ধরনের বই নেই?

বাংলা বই অনেক পড়েছে বটে কল্যাণী; মাঝে মাঝে এক একটা বইকে মনে হয়েছে—মন্দ নয়; বেশ তো! এরকম একে একে ঢের বই বেশ লাগল। কিন্তু মিনুকে সেই বইগুলোর নাম বলতেই সে এমন হেসে ফেলল—

মিনু এবার বি-এ দেবে। ঢের জানে।

মিনুর কথাই গ্রাহ্য করতে হয়।

মিনু বলে বাংলায় আবার বই আছে নাকি?

সুপ্রভাও তাই বলে।

চিতু তো বলবেই; সে বাংলা পড়তেও পারে না। ছেলেমানুষের মত বানান ভুল করে যা-তা বাংলা চিঠি লেখে।

মীরার আবাল্য এদের সঙ্গে মত মেলে না। মীরা বাংলা সাহিত্যের ঢের জানে। কল্যাণীর মনে হ'ল ছোড়দা সেদিন কলকাতায় আর্টের কথা বলছিল—থিয়েটার থেকে ফিরেও কি সব বলছিল; আস্তে আস্তে মনে হতে লাগল কল্যাণীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে দিনকার সেই গঙ্গাটাকে মনে হ'ল; মীরার কবিতার খাতা Intelligent Women's Pride-এর ভেতরেই রয়েছে। খাতাটা সে কোলের উপর উঠিয়ে রাখল।

বইটা খুলল।

কিন্তু পড়তে ইচ্ছা করছিল না।

আশ্বিনের ভোরবেলা।

বহুয়ার মাঠটা কি সবুজ; সাদা সাদা কাশে ভরে গেছে; মাছরাঙা উড়ছে, এক ঝাঁক গাঙশালিখ কিচির মিচির করছে; ক্ষীরুই গাছের ডালে একটা টুনটুনি।

সুপ্রভা বলেছিল নইনীতালে গিয়ে তার মেজদির কাছে থাকবে—মেজদির বরের কাছে; রামঃ! ওতে কি মনুষ্যত্ব থাকে? মিনু যা বলেছে তাইই ঠিক, মেয়েদের স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়—কিম্বা করে খেতে হয়। বাবার সঙ্গেও চিরদিন থাকবার অধিকার নেই মেয়েদের। বাবা তো চিরকাল বেঁচে থাকেন না। এইসব ভাবনা কল্যাণীর মনকে নিরুদ্দেশের মধ্যে ঘোরাচ্ছিল।

কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল তার।

গুণময়ী এক গজ মসলিনের কাপড় নিয়ে এলেন

কল্যাণী বললে—কি হবে মা এটা দিয়ে?

—এটার ওপর একটা নক্সা আঁকব

—কিসের নক্সা

—পদ্মর

কল্যাণী হেসে উঠল—

গুণময়ী বললেন—হাসলি যে, ঠাট্টা হ'ল বুঝি? পদ্মর নক্সা আমি আঁকতে পারি না?

কল্যাণী বললে—না, তা নয়, মা, আমি ভাবছিলাম এত নতুন নতুন নক্সা থাকতে সেই একঘেয়ে পদ্মর নক্সা ছাড়া আর তুমি কিছু খুঁজে পেলে না?

জুতোর শব্দ হচ্ছিল

কল্যাণী বললে—বাবা আসছেন বুঝি।

পরের মুহূর্তেই পঙ্কজবাবু আর সেই ভদ্রলোকটি এসে দু'টো সোফায় বসলেন। কিশোরও এল; ইতস্তত সোফা ছড়ানো ছিল—সেও একটায় বসল।

কল্যাণী দেখলে মা উঠলেনও না, চোখও তুললেন না, ঠায় বসে ডিজাইন বুনছেন—একটা পদ্মর ডিজাইন।

কল্যাণীও বসে রইল।

ভদ্রলোকটি গুণময়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি তো আপনাদের সকলকেই চিনি—কাজেই লজ্জার আর কি?

গুণময়ী একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ, লজ্জাসঙ্কোচের আর কি?

কল্যাণীর মনে হ'ল লজ্জার যে কিছু বা কিছু নয় সে সব কথা এ মানুষটিকে জিজ্ঞেস করেছে নাকি কেউ? ভারী তো গায় পড়ে কথা বলার অভ্যাস। সে বিরক্ত হয়ে বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোকটি বললেন—কন্তা আমাকে একেবারে আপনাদের অন্দরের মধ্যে টেনে এনেছেন আমি আপনাদের ডিস্টার্ব করছি না তো—

গুণময়ী বললেন—আপনি আসাতে খুব খুসি হয়েছি—

—তার চেয়েও বেশি খুসি হয়েছি আমি—

পঙ্কজবাবু একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—তুমি একটা চুরুট তুলে নাও চন্দ্রমোহন।

এর নাম তবে চন্দ্রমোহন? কল্যাণী ঘাড় তুলে একবার তাকাল; চন্দ্রমোহন তার দিকে কেমন এক রকম করে যেন তাকিয়ে রয়েছে। কল্যাণীর কেমন যেন গ্লানি বোধ হ'ল।

কেমন কুৎসিৎ—বিশ্রী চেহারা—হলদে রং চীনের মত মুখ—মুখে আঁচিল ভরা ভরা দাড়ি—এ ভদ্রলোক কোত্থেকে এলেন? কেন এলেন? তাদের পরিবারেই বা কেন? বাবার সঙ্গেই বা এত খাতির কেন? সমস্ত বাড়িটা পড়ে থাকতে কল্যাণী মধুর অবসরের জায়গায়ই বা কে আসতে বললে তাদের...ভাবতে ভাবতে কল্যাণীর সমস্ত শরীর মন যেন পীড়িত হয়ে উঠল।

সে উঠে যেত—কিন্তু নড়তে চড়তেও তার যেন কেমন ঘৃণা বোধ হচ্ছিল—বইটার দিকে একমনে তাকিয়ে রইল সে।

চন্দ্রমোহন বললে—আমি চুরুট খাই না; মাপ করবেন।

পঙ্কজবাবু গুণময়ীকে বললেন—দেখেছ এমন সৎ—একটা চুরুট অব্দি খায় না।

গুণময়ী একটু হাসলেন

চন্দ্রমোহন বললে—আমাকে লজ্জা দেবেন না, আপনার উদার অটুট অতুলনীয় চরিত্রের কাছে আমাকে টেনে এনে কেন কলঙ্ক বাড়ানো। চুরুট কেন, আপনি যদি মদের বোতলও হাতে ধরেন তবুও তা আপনার চরিত্রের মাধুর্য্যে যেন সুধায় রূপান্তরিত হয়ে যায়—

কল্যাণীর এমন হাসি পেল, তার মনে হ'ল ছোড়দাও নিশ্চয়ই হাসছে; কিন্তু কিশোরের মুখ গম্ভীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার দিকে তাকিয়ে দেখল কল্যাণী—মাও স্থির; বাবার মুখ প্রসন্ন।

কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবল; এ কি, চন্দ্রমোহনের ভণ্ডামি কেউ ধরতে পারছে না কেন?

চন্দ্রমোহন গুণময়ীর দিকে তাকিয়ে বললে—আপনার অনেক পুণ্যি মা, জন্মজন্মের তপস্যায় এমন শিবস্বামী কপালে আসে—

গুণময়ী ও পঙ্কজবাবু দু'জনের দিকে লক্ষ্য করেই খুব গভীর ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করল চন্দ্রমোহন।

কল্যাণীর মনে হ'ল চন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে তার মনের ঝাল আগের মতন তেমন তীব্র নেই—লোকটা অসহ্য বটে, কিন্তু তবুও অগ্রাহ্য করতে পারা যায় একে, ক্ষমা করতে পারা যায়।

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার আলুবখরার টক ভারী চমৎকার মা

গুণময়ী বললেন—একদিন তো শুধু রেঁধেছি

—ঐ একদিনেই কিনে নিয়েছেন—

পঙ্কজবাবু বললেন—যে ক'দিন আছে, একটু আলুবখরা দু'বেলা করলেই পার

গুণময়ী প্রীত হয়ে বললেন—আমি আগে যদি জানতাম—

চন্দ্রমোহন বললে—আমার মা পিসিমা জেঠিমা মাসীমা মামী—সবারই দুর্দান্ত রান্নার হাত—কলকাতার সব জাঁহাবাজ নেমন্তন্ন সামলান—কিন্তু টক, এমন চাটনি তো কেউ রাঁধতে পারেন না।

সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার চিংড়ী কাটলেটই বা কি চমৎকার! কলকাতার কত রেস্টুরেন্টে আমি খেয়েছি—একদিন এক চীনে বারী খাসা রেধে দিয়েছিল—কিন্তু আপনার হাতের ভাজা খেয়ে বুঝলাম যে এদ্দিন ছিবড়ে খেয়েছি—

গুণময়ীর চোখ মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পঙ্কজবাবু বললেন—গিন্নী রান্না শিখেছিলেন তাঁর মার কাছে— খুব ঝাঁঝালো রাঁধুনির গুষ্টি।

চন্দ্রমোহন বললে— আপনি কি আঁকছেন মা?

পদ্ম

বাঃ কি চমৎকার ছুঁচের কাজ উঠে আসছে—কি গ্র্যান্ড বাঃ! এমন চেকনাই পদ্ম তো আমি কোনোদিন দেখিনি—

পঙ্কজবাবু বললেন—বেশ হাত আছে—

গুণময়ী বলেন—এখনও হয়নি—

চন্দ্রমোহন বললে—এরকম আরও বুনেছেন আপনি?

—হ্যাঁ

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার তো শুধু এই করাই উচিত—যে জিনিয়াস আর্টের থাকে অন্য কিছু দিয়ে খোয়ানো উচিত নয়—

কল্যাণী শিহরিত হয়ে উঠল; এ লোকটাও আর্টের কথা বলছে?

চন্দ্রমোহন পঙ্কজবাবুকে বললে—আপনাদের ড্রয়িংরুমে কার্পেট দেখলাম—চমৎকার কার্পেট—এমন কার্পেট কোথাও তো দেখিনি আমি আর—অথচ কলকাতায় বড় বড় ব্যাপারীদের সঙ্গে আমার কারবার—

সকলেই গর্ব অনুভব করতে লাগল—কি না লাগল ঠিক বুঝতে পারল না কল্যাণী। লোকটা বেশি বাড়াবাড়ি করছে না তো।

চন্দ্রমোহন বললে—আর কি জমকালো বই বাড়িখানা করেছেন—ঠিক যেন একটা পুরীর মত; কলকাতায় কত রাজামহারাজার বাড়ি দেখেও এরকম মন ওঠেনি আমার—

চন্দ্রমোহন গম্ভীর সম্ভ্রম বিস্ময়ের সঙ্গে বাড়িখানার কড়ি বর্গা দরজা জানালা খিলান চৌকাঠের দিকে তাকাতে লাগল—

বাড়িখানার রেণুপরমাণুর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রমোহনের সঙ্গে অন্য অন্য সকলেও খুব গৌরব বোধ করছিল হয়তো; কিম্বা আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হয়েছিল।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললে—এই ছেলেটি আপনার খুব বড় কবি হবে—

পঙ্কজবাবু ও গুণময়ী ঈষৎ কৌতূহলে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল—

চন্দ্রমোহন বললে—এমন ভাবুক চিন্তাশীল চিত্তবৃত্তি শিগগির আমি আর দেখিনি—

পঙ্কজবাবু বললেন—কি করে বুঝলে?

চন্দ্রমোহন বললে—চোখ নাক কপাল দেখলেই বুঝতে পারা যায় এর কত বড় প্রতিভা—আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে বসে বসে দেখেছি—

অবাক হয়ে বসে বসে বাস্তবিক সে দেখছিল কল্যাণীকে; কিন্তু কল্যাণী মুখও তুলল না—কিশোরের প্রতিভার প্রশংসার কথা শুনেও চন্দ্রমোহনের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনবার জন্য বিশেষ কোনও আগ্রহ বোধ করল না সে; কল্যাণীর মনে হ'ল এ লোকটি সব জিনিসকেই চমৎকার বলে, সাজিয়ে সাজিয়ে মনের মতন কথা বলে বাবা মার মন গলাতে চায় শুধু, কল্যাণী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তাদের ড্রয়িং রুমের কার্পেট কলকাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব দোকানের সব রকম কাপের্টের চেয়ে সেরা—অত্যন্ত শস্তা সাধারণ কার্পেট তাদের; মার হাতের আঁকা পদ্ম অত্যন্ত সাদাসিদে জিনিস—আলুবখরার টকও তেমনি—চিংড়ির কাটলেটও তাই—

কিন্তু চন্দ্রমোহনের হলদে রং—আর চীনেম্যানের মত মুখ—মুখ ভরা আঁচিল আর আঁচিলের দাড়ি—সেগুলো যে অত্যন্ত কুৎসিৎ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কল্যাণী ভ্রূকুটি করে বসে রইল।

পঙ্কজবাবু বললেন—এখন কাজের কথা।

চন্দ্রমোহন অত্যন্ত বিরসভাবে বললে—কাজ আর কি? পাটের জন্য আমাদের বিস্তর ক্ষতি দিতে হয়েছে—

—কত?

—আশী লাখ টাকা

—আশী লাখ!

চন্দ্রমোহন একটু হেসে বললে—আশী লাখ আবার টাকা

বলে কল্যাণীর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু এ মেয়ের মুখের ভিতর কোনো পরিবর্তন নেই; সে ঘাড় গুঁজে বই-এর পাতার দিকে তাকিয়ে পড়ে যাচ্ছে—

পঙ্কজবাবু বললেন—তাহ'লে অদ্বিতীয় বিড়লার ব্যবসা

—হ্যাঁ পাঁচ সাত কোটি টাকার

—পাঁচ সাত কোটি

চন্দ্রমোহন একটু বিনয়ের সঙ্গে বললে—তা হ'লই বা পাঁচ সাত কোটি! টাকাকে আপনি অত বড় করে দেখেন কেন পঙ্কজবাবু। টাকাই কি সব? তাহ'লে বেনেরাই তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাপুরুষ হ'ত। মহাপুরুষ—মনুষ্যত্ব সে সব একেবারেই আলাদা জিনিস।

এ কথাগুলো শুনতে পঙ্কজবাবুর ভালো লাগছিল—গুণময়ীরও।

কল্যাণীরও মনে হ'ল বেশ বলেছে; খনখনে গলাটাকে আগের মতন তেমন খনখনে বোধ হচ্ছে না যেন; কেমন যেন আন্তরিকতায় ভিজে উঠেছে এবার।

অনেকক্ষণ পরে এবার চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল কল্যাণী। দেখল চন্দ্রমোহন তার দিকেই তাকিয়ে আছে—খুব অবসন্ন মনে হচ্ছে লোকটাকে; কেমন যেন একটা নিরন্তর নিবেদন কল্যাণীর কাছে তার। চন্দ্রমোহনের ওপর আগের মত ঘৃণা নেই যেন আর কল্যাণীর—কেমন একটু দয়াবোধ হতে লাগল এ লোকটির জন্য—মনে হতে লাগল এর চেহারা তো এ নিজে তৈরি করেনি—বিধাতা দিয়েছেন; কিন্তু এর মনটা তো এ নিজে প্রস্তুত করে তুলেছে একরকম মন্দ না—

কিন্তু এ সব ভাবনা কল্যাণীর দু'এক মুহূর্তের জন্য। এ লোকটি কি—এবং কি নয় সে নিয়ে কল্যাণী আর মাথা ঘামাতে গেল না।

সেরকম চিন্তা তার ভালো লাগছিল না। মোটেই ভালো লাগছিল না।

বারো

চন্দ্রমোহন বললে—ব্যবসার ফাঁক নানারকম—আজকাল সবাই দেখছি গুড় খায়: জানেন মা ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল সার্জন এমন কি বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বাড়িতে এসে গুড় দিয়ে চা খান

পঙ্কজবাবু অবাক হয়ে বললেন—বটে

গুণময়ী বললেন—ম্যাজিস্ট্রেটও

—হ্যাঁ; কাজেই এই বেলা গোটা কয়েক চিনির কল শানাব ঠিক করেছি—বেশ পড়তা হবে

পঙ্কজবাবু বললেন—ব্যবসায় তোমাদের মাথা বেশ খোলে—

চন্দ্রমোহন বললে—ক্যাপিটেল থাকলেই মাথা খোলে—

—তাও বটে

টাকা আগুনে গলিয়ে দিনরাতই টের পাচ্ছি যে কি দুর্দান্ত পক্ষিরাজ ঘোড়ায়ই চড়েছি পঙ্কজবাবু—

—পাঁচ সাত কোটি টাকা। তুমি একাই?

চন্দ্রমোহন একটু আমতা আমতা করে বললে—না, হ্যাঁ—একরকম একাই চালাচ্ছি

—ক'জন পার্টনার?

—সব স্লিপিং—

—ক'জন?

—আছে দু'এক জন

পঙ্কজবাবু আর বেশি চাপতে গেলেন না; পাঁচ সাতজন পার্টনার থাকলেই বা কি—ছ সাত কোটি টাকার ব্যাপার যখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রমোহন বাংলা জোড়া একটা মুচি বোর্ড, জার্মান ও ডেনিশদের মত বাঙালিদের একটা লটারি অর্গানিজেশন, বিপুল বিরাট স্বদেশী ব্যাঙ্ক, স্বদেশী ইনসিওরেন্স কোম্পানি ইত্যাদি নানারকম ব্যবসার কথা অনেকক্ষণ বসে বললে—

তারপর যখন বারান্দায় কেউ আর ছিল না তখন পঙ্কজবাবুর কাছে ধীরে ধীরে কল্যাণীর কথা পাড়লে।

মেয়ের পিতার কাছ থেকে এত বেশি ভরসা পেল চন্দ্রমোহন যে সে রাতটা ঘুমিয়ে—ঘুমের মধ্যে দিব্যযোনিদের স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিতে পারলেই ভালো হত তার। কিন্তু সারাটা রাত ছটফট ক'রে—জেগে থাকতে হ'ল; মুখে মাথায় চাপড়ে চাপড়ে ঠাণ্ডা জল দিয়েও কোনো লাভ হ'ল না, কোনো লাভ হ'ল না আত্মরতি নিগ্রহের পথে ঘুমের আবেশ অধিকার করে নিতে গিয়ে।

পরদিন সন্ধ্যায় কেউই বাসায় ছিল না।

হরিচরণ চাটুয্যের ছেলেরা ঘটা করে যাত্রা দিচ্ছে—কর্তা গিন্নী প্রসাদ কিশোর সব সেখানে বিকেল থেকেই। কত রাতে যে ফিরবে তার ঠিক ঠিকানা নেই কিছু। কল্যাণী যায়নি—সকাল থেকেই আজ তার মাথা ধরে রয়েছে—

স্মেলিং সল্টের বোতল—মীরার কবিতার খাতা—Intelligent—এক শিশি মেন্থল—ও এক ফাইল কি যেন ট্যাবলেট নিয়ে তেতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসেছিল সে।

দুপুরবেলা চশমাটা খুলে রাখতে মাথা ধরা যেন আরো বেশি বেড়ে গেছে; কল্যাণী সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবছিল চশমা না বদলাতে হয় আবার; চোখ তাকে পৃথিবীতে অকৃতার্থ করে তুলেছে না কি?

বইটা সে খুলে—পৃষ্ঠা পঁচিশেক আন্দাজ পড়া হয়েছে—সে কিছুই বোঝে না; এ বই তার ভালো লাগে না।

বইটা সে বন্ধ করে রাখল।

কি যে ভালো লাগে তার—এই পৃথিবীতে কোথায় যে তার প্রয়োজন—জীবনে নতুন রহস্য কখন যে উদঘাটিত হবে কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

ভিলুন্দির জঙ্গল আঁধার হয়ে উঠছে—

সন্ধ্যার কাক নিজের ঘরে যাচ্ছে তার—না জানি কতখানি গৃহিণীপনা রয়েছে এর মধ্যে—নিস্তব্ধ পরিতৃপ্ত দাম্পত্য সম্পদ রয়েছে!

কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবছিল—

জুতোর শব্দ শোনা গেল—

হয়তো বাবা আসছেন।

Intelligen টা আবার খুলল কল্যাণী; একটু স্মেলিং সল্ট শুঁকে নিল—হলের পুব—ধারের বাঁ দিকের দরজাটা একটা ধাক্কা খেয়ে খুলে গেল—

কল্যাণী চমকে উঠে বললে—কে

চন্দ্রমোহন বললে—আমি

মুহূর্তের মধ্যে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে—

কল্যাণী বললে—আপনি এখানে?

—ওঁরা সব কোথায়?

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল; কিছু বলতে পারলে না সে—

চন্দ্রমোহন বললে—তিনতলাই তো ঘুরে এলাম—কাউকেই তো দেখছি না কল্যাণী ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে করতে বললে—কেউ নেই

—কোথায় গেছে?

যাত্রা শুনতে।

—যাত্রা কোথায়?

—হরিচরণ চাটুয্যের বাড়ি—

—আপনার বাবা মা সব সেখানে?

—হ্যাঁ

—প্রসাদও?

—হ্যাঁ

—কিশোর নেই?

কল্যাণী একটু বিরক্ত হয়ে বললে—বললামই তো—

চন্দ্রমোহন বললে—ওঃ। তা বলেছেন বটে—আমার ভুল হয়েছিল—আমাকে ক্ষমা করবেন।

একটা সোফার ওপর বসল সে—এমন নির্বিবাদে; কোনোরকম বালাই যেন নেই লোকটার।

কল্যাণী রেগে কাঁই হয়ে এর এই অদ্ভুত অসভ্যতা দেখল; তারপর ভাবল, উঠে যাই। কিন্তু তক্ষুণি তার মনে হ'ল কেন উঠে যাবে সে, তার নিজের জায়গার থেকে একটা উটকো গোলা লোক এসে তাকে সরিয়ে দেবে? সে সরে যাবে? তা কিছুতেই হবে না।

সে ইজি চেয়ারে চেপে বসে রইল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার সব কটি ভাইর নামই খুব সুন্দর—বিজলী—প্রসাদ—কিশোর—বাঃ

একটু পরে—আপনার মার নামও; ওরকম নামের যে কত বাহাদুরী—কি চমৎকার নাম যে—আমি ভেবে শেষ করতে পারি না।

কল্যাণী নিস্তব্ধ হয়েছিল।

চন্দ্রমোহন বললে—চমৎকার নাম!

অন্ধকার হয়ে আসছিল—বইয়ের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতে পারা যায়—একটা অক্ষরও বুঝতে পারা যায় না—বইটাকে একটা বিষের পুঁটুলি বলে মনে হ'ল কল্যাণীর—বাপ মা দাদাদের মর্মান্তিক নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে কান্না পেতে লাগল—কোথায় তার পাশে বসে সকলে মিলে গল্প করবে তারা না এ কি অদ্ভুত অঘটনের ভিতর তাকে ফেলে পালাল সব—

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার বাবার কাছ থেকে জেনে নিলাম আপনার নামটা—

কল্যাণী ব্যথিত হয়ে নদীটার দিকে তাকাল

চন্দ্রমোহন বললে—এমন চমৎকার নাম! সবচেয়ে চমৎকার নাম আপনার! বাঃ কি চমৎকার!

চন্দ্রমোহন বললে—মনে মনে আউড়ে কত কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছি আমি; কত কৃতার্থ হচ্ছি। কিন্তু এ সার্থকতাকে আরো পূর্ণাঙ্গীণ করে তুলতে পারা যায়—

কল্যাণী বইটার দিকে আবার তাকাল—

চন্দ্রমোহন বললে—যায় না!

নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়ে বললে—তা যায়—

ওসমান যাচ্ছিল—

কল্যাণী বললে—ওসমান

—হুজুর

—একটা বাতি নিয়ায় তো

—হুজুর—বললে ওসমান চলে গেল।

কল্যাণী চশমাটা খুলে আঁচল দিয়ে মুছতে লাগল—

চন্দ্রমোহন বললে—ভারী চমৎকার চমশাটা তো আপনায়—বাঃ, কেমন সুন্দর! লরেন্সের বাড়ির?

প্রতিপক্ষের থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বললে—আমার এক বন্ধু খুব বড় চোখের ডাক্তার—ডাক্তার হালদার—খুব শাঁসালো—বিস্তর পয়সা করেছে।

কল্যাণী ধীরে ধীরে চশমা পরল।

চন্দ্রমোহন বললে—এমন চমৎকার মানায় আপনাকে! চশমা আঁচলে! যেমন চশমার সৌন্দর্য তার চেয়ে কত বেশি চমৎকার যে—

ওসমান বাতি আনল।

কল্যাণী বললে—ঐ তেপায়টা এখানে এনে তার ওপর রাখ—

রেখে দিয়ে ওসমান চলে গেল।

চন্দ্রমোহন বললে—দেশে দেশে কত সুন্দর মুখ দেখেছি আমি কিন্তু কাল থেকে যে অতুলনীয় রূপরাশি আমি দেখলাম পৃথিবীতে যে এরকম থাকতেও পারে কোনোদিন তা কল্পনাও আমি করতে পারিনি—

কল্যাণী বললে—আমি তো আপনার কোনো কথারই জবাব দিচ্ছি না—মিছেমিছে আপনি এখানে বসে কেহ হায়রান হচ্ছেন; ওরা আসুক—তারপর কথা বললে ঢের পরিতৃপ্তি পাবেন আপনি—

চন্দ্রমোহন বললে—ভুলে করলেন

কল্যাণী বাতির আলোর ভিতর বই খুলে ঘাড় ফিরিয়ে রইল।

—আমার কিসে পরিতৃপ্তি তা আমি কি জানি না?

কল্যাণীর মুখে কোনো জবাব জুয়াল না; মুখে যা আসে তা বড় অভদ্র—উগ্র—কেমন মর্মান্তিক। শিষ্টাচার বজায় রেখে কিছু কি সে বলতে পারে না?

কল্যাণী ভাবতে লাগল।

চন্দ্রমোহন বললে—পৃথিবীর সবচেয়ে পরিতৃপ্তি আমার এইখানে বসে—বসে শুধু—

চন্দ্রমোহন আরো বললে—আপনার সান্নিধ্য বসে যা তৃপ্তি তা স্বর্গেও নেই

কল্যাণী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে বললে—কিন্তু ঠিক তাতেই আমার সবচেয়ে বেশি অতৃপ্তি—বড্ড অস্বস্তি—আপনি আমার কথা বুঝেছেন?

নিজের গলার ভয়াবহ রুক্ষতায় কল্যাণী নিরস্ত হয়ে গেল। আরো ঢের কঠিন সাংঘাতিক অনেক কথা বলবে ভেবেছিল সে। (কিন্তু কণ্ঠ তার করাতের মত এক টানেই ঢের জটিলতা কেটে দিয়েছে—কৃতার্থ হয়ে বইটার দিকে তাকাল সে—)

চন্দ্রমোহন অম্লান বদনে বললে—আজ আপনার অতৃপ্তি কিন্তু একদিন আপনিও তৃপ্তি পাবেন—

কল্যাণী স্তম্ভিত হয়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রমোহন বললে—বড় একটা ভাঁহা কথা বলে ফেলেছি কল্যাণী দেবী।

একটু পরে আস্তে আস্তে বললে—কিন্তু একদিন তা আর মনে হবে না।

একটা ব্যাধের জালের মত কঠিন ছিদ্রহীন যেন এইসব কথা, কল্যাণীর হৃদয় ভীরু পাখির মত নয় বটে, একটুও নয়, কিন্তু তবুও মনটা কেমন ছমছম ক'রে উঠল তার।

চন্দ্রমোহন বললে—ছোটদের বড্ড ভুল ধারণা—আপনার মত ছোট যখন ছিলাম তখন আমিও বড্ড ভুল ভাবতাম। কিন্তু এখন আমার বয়স বিয়াল্লিশ—

সে একটু থামল।

তারপর বললে—আপনারও যখন বিয়াল্লিশ হবে ঠিক আমার মতই ভাববেন।

চন্দ্রমোহন একটু কেশে বললে—এখন আপনি রূপ চান; চান না? হয়তো শুধু রূপই চান—পুরুষমানুষের, মেয়েলোকের—

চন্দ্রমোহন একটু উপহাসের সুরে হেসে বললে—যে পুরুষের শুধু রূপ আছে সে যে কত অবজ্ঞেয় জীবনের সব সাধ সাধনায় মণিকর্ণিকার মত সুন্দর আগুন জ্বালিয়ে বেড়াবার মত তার যে আর জুড়ি নেই—একদিন তা বুঝবেন।

চন্দ্রমোহন বললে—টাকার দাম সবচেয়ে বেশি—এও একদিন বুঝতে হবে।

কল্যাণী কাঠের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল—

চন্দ্রমোহন উপলব্ধি করে বুঝে নিল। অত্যন্ত সহানুভূতির সুরে বললে—মানুষের বিচারের ভুল সুন্দর বৈকি—মুহূর্তের ইন্দ্রধনুর মতনই চেকনাই; রূপ চাই বিদ্যা চাই কুশলতা চাই গান চাই বাজনা চাই আর্ট চাই—কিন্তু তবুও একদিন বুঝবেন যে এ সবের চেয়ে ঢের বড় হচ্ছে টাকা আর সে একটু ভেবে বললে, স্বাস্থ্য আর চরিত্র—

নিজের সুস্থতার কথা বলতে লাগল চন্দ্রমোহন—এই বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যে এক দিনের জন্যও কোনো অসুখ করেনি তার; ভবানীপুরের কোনও শিখই পাঞ্জায় তার সঙ্গে লড়ে উঠতে পারে না; যে কোনও লম্বা চৌকো ক্যামেরন হাইল্যান্ডারকে কুস্তিতে সে হারিয়ে দিতে পারে; (হয়েছে? কলকাতায় সে রোজ পাঁচ সের ঘি সাত-আট সের এলাচ—পনেরো কুড়ি সের কিসমিস—পেস্তা বাদাম আখরোট বেদানা সবই এইরকম আন্দাজ খায়—)

চন্দ্রমোহন তার ধর্মের কথা পাড়ল—ভগবানে অটল বিশ্বাস না রাখলে অবিশ্যি কোনো টাকারই কোনো মূল্য নেই; একমাত্র জিনিস যা টাকার চাইতেও বড়—তা হচ্ছে প্রেম—। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম। কিন্তু ভগবান স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের চাইতেও ঢের বড় জিনিস—এত বড় যে কল্পনা করতে পারা যায় না। সেই ভগবানে আত্মনিবেদন না করতে পারলে কিছুই হয় না।

চন্দ্রমোহন বললে ঃ কিন্তু ভগবানের এমনই নিয়ম যে তাঁর ভক্তকে তিনি নিজেই চিনে নেন, নিজেই তার ওপর কৃপা করেন—বড় বিশেষ রকমের কৃপা সে এক—সমস্ত অমঙ্গল অধর্মের পথ থেকে নিজেই তাকে তিনি রক্ষা করেন।

চন্দ্রমোহন বললে ঃ নিজের জীবনে ভগবানের সেই বিশেষ কৃপা আমি রোজি অনুভব করি—প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করি। যে জিনিস আমি চেয়েছি তিনি সব সময়ই আমাকে দিয়েছেন—একবারও তো বঞ্চিত করেননি। টাকাও অনেক সময় মানুষকে প্রতারিত করে—কিন্তু ভগবানের ভালোবাসা—মায়ের ভালোবাসার চেয়েও আন্তরিক; স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের চেয়েও; কত যে আন্তরিক তা ভেবে কিনারা করতে পারা যায় না।

চন্দ্রমোহন বললে—আমার জীবনের সম্পদ টাকা নয়;—ভগবানের কাছে এই আত্মনিবেদন শুদ্ধ হয়ে নির্মল হয়ে—আমার জীবনকে সব চেয়ে বড় সম্পদ দিয়েছে—

চন্দ্রমোহন বললে—টাকার কথা আমি তুলতামই না—আপনার বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন—শুনেছেন হয়তো—সাত কোটি টাকার কার্বার আমাদের—

টাকার সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু আর বললে না চন্দ্রমোহন (বলবেই বা কি; সে অনেক কথা। বড় জটিলতার ব্যাপার।)—

সে কিছুক্ষণের জন্য থামল।

পঙ্কজবাবু এসে পড়েছিলেন

বললেন—চন্দ্রমোহন তুমি এখানে?

কল্যাণীকেও দেখলেন তিনি,—মেয়ে ভাবল বাবা না জানি এ লোকটাকে কত দূর অভদ্র— অপদার্থ বলে বুঝতে পেরে দু'কথা শুনিয়ে বের করে দেবেন—কিন্তু অবাক হয়ে দেখল কল্যাণী বাবা তা কিছুই তো করলেন না— তাঁর মুখ দিব্যি প্রসন্ন— এখানে এসে আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে যেন—

কল্যাণীর মন সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল—এমন নিরাশ নিঃসহায় মনে হতে লাগল নিজেকে তার—

পঙ্কজবাবু বললেন—চন্দ্রমোহন, যাত্রা শুনতে গেলে না যে?

—যাত্রা আমি শুনি না।

—ভালো লাগে না?

—না।

—কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নাচগানে ক্রমে ক্রমে একটু অতিশয্য এসে পড়ে—মজলিসী ভাব আসে—নানা কথা বলা হয়—ফূর্তিতামাসার বাঁধ থাকে না—এই পূজোআচ্চার সময়ে যাত্রাফাত্রায় তো ঢের কেলেঙ্কারি হয় মদ থেকে শুরু করে—

চন্দ্রমোহন থামল—

পঙ্কজবাবু চুরুট জ্বালালেন; এক টান দিয়ে বললেন—তা যা বলেছ—ভাববার মত কথা বটে—

চন্দ্রমোহন বললে—আগেকার পালাগানের সে বিশুদ্ধতাও নেই। কেমন একটা আন্তরিকতা ছিল তখন! করুণা মধুরতা প্রেমের কি কোনও অবধি ছিল পঙ্কজবাবু? ছোটবেলার কথা মনে করে এখনও মন এমন ভিজে ওঠে। সে সব দিন আর নেই—বাইজী খেমটাওয়ালী মদ—হৈরে, রাগ রক্ত, কি যে সব—সে করুণতা নেই—মধুরতা নেই—প্রেম নেই—

পঙ্কজবাবু যেন ভক্তির কথা শুনছিলেন—কল্যাণীর মনে হ'ল—গয়াসুরের মুখে।

তেরো

পরদিন সকালে উঠে কল্যাণী দেখল তার টেবিলের বইখাতা লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে—কে যেন সমস্ত নেড়েচেড়ে গেছে।

মীরার কবিতার খাতার ভিতর যে ফার্ণ ও গোলাপফুলগুলো ছিল সে সব টেবিলের ইতস্তত রয়েছে—কবিতার খাতাটও খুঁজে বের করতে তার ঢের দেরী লাগল—একগাদা বইখাতার ভিতরে কোথায় যে সেটাকে কে গুঁজে রেখে দিয়েছে–Intelligent বইটা পাওয়া যাচ্ছে না।

কল্যাণী চোখ কপালে উঠল; তন্ন তন্ন করে সমস্ত টেবিল খুঁজে দেখল সে—দেরাজগুলো দেখল—একে একে বইগুলো আস্তে আস্তে তুলে তুলে সমস্ত খুঁজে দেখল আবার—সমস্ত টেবিলের বই একটার পর একটা করে সাজিয়ে রাখল—কিন্তু মিনুর সে বই কোথাও পাওয়া গেল না।

শেলফ দেখল সে—ছোড়দার টেবিল দেরাজ দেখে এল—মেজদা ও বাবার ঘরেও ঘুরে এল—কিন্তু কোথাও সে বই নেই।

বই কি হল? কে নিল? বিরক্তিতে অশান্তিতে রাগে একেবারে গুম হয়ে উঠে কল্যাণী কিশোরের ঘরের দিকে গেল—নিশ্চয় এ সব ছোড়দার কাজ!

বাবার কাছে বলে মেজদার কাছে বলে দেখাব আজ মজা বাছাধনকে আমি—থিয়েটারের সব কথা বলে দেব—স্টিমারে যে হুইস্কি খেয়েছিল সব বলে দেব বাবাকে আমি—কিশোর নিজের টেবিলে বসে একটা নাটকের মতো কি যেন লিখছিল—

কল্যাণী ঢুকে পড়ে বললে—ছোড়দা

কিশোর গ্রাহ্য না করে লিখে যাচ্ছিল

কল্যাণী বললে—ছোড়দা শুনছ—

—কি

—আমার টেবিল তুমি ঘেঁটেছিলে?

—তোর টেবিল?

—হ্যাঁ

কিশোর বললে—তোর আবার টেবিল আছে নাকি?

—হাত দিয়েছিলে নাকি বল ছোড়দা

কিশোর নাটক লেখায় মন দিয়ে বললে—কি দরকার তোমার টেবিল নেড়েচেড়ে আমার?

—নাড় নি?

কিশোরের কথা বলবার অবসর ছিল না, সে ঘাড় নেড়ে বললে, না, সে হাত দেয়নি।

—সত্যি বলছ ছোড়দা

কিশোর কলের মতো ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ সত্যি বলছি—

কল্যাণী বিশ্বাস করতে পারল না—

বললে—তবে আমার বই গেল কোথায়?

কিশোরের কান এদিকে ছিল না—সে কোনও জবাব দিল না।

কল্যাণী গলা চড়িয়ে বললে—আমার বই তাহ'লে কোথায় গেল ছোড়দা? বইর কি ডানা হ'ল নাকি।

—কি হয়েছে?

—আমার বই পাচ্ছি না।

—কি বই?

—দরকারী বই।

—নাম নেই? (কি দরকারী বই?)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী ক্ষুব্ধ হয়ে বললে—কেন, Intelligent...

কিশোর ফ্যা ফ্যা করে হেসে উঠল

কল্যাণী বললে—নিয়েছ নাকি তুমি?

— ও সব বইর কিছু বুঝিস তুই?

—খুব বুঝি

—ছাই বুঝিস

—বুঝি আর না বুঝি—তাই বলে তুমি না বলে নিয়ে যাবে কেন?

—আমি না বলে নিয়ে গেছি?

কিশোর চটে লাল

—কে নিল তাহ'লে

—তা আমি কি জানি?

—নাও নি তুমি?

—ফের ট্যাটামি করবি তো বের করে দেব এখান থেকে!

কল্যাণী ঠোঁটে আঁচল গুঁজে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ঘরে চলে এল।

বইটা কোথায় গেল তাহ'লে। ছোড়দা নেয়নি; ছোড়দা নিলে ওরকম চটে উঠত না। শেষ পর্যন্ত বলে দিত; বইটা ফিরিয়ে দিত। চটে উঠত না। ছোড়দা আর যাই করুক, কল্যাণীর সঙ্গে এরকম ধরণের ধাষ্টামো কোনও দিনও সে করে না।

কল্যাণী অনুপায় হয়ে বসে রইল।

কোথায় গেল বই? কে নিল?

বিছানাটা ঝেড়ে খুঁজল সে। বালিশের নিচে—তোষকের নিচে অনেকবার দেখল—তেতলায় গিয়ে দেখে এল—কোথাও নেই।

কল্যাণী মেজদার ঘরে একবার গেল।

প্রসাদ ল' জার্নাল পড়ছিল—

কল্যাণী খুব ধীর শান্তস্বরে বললে—মেজদা

প্রসাদ চুরুটে একটা টান দিয়ে বললে—কি

—আমার একটা বই তুমি দেখেছ?

—তোমার বই?

—হ্যাঁ

—কি বই?

কল্যাণী একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললে—অবিশ্যি সে বই আমার পড়া উচিত নয়—

—পড়া উচিত নয়! কি বই কল্যাণী?

—শুনলে রাগ করবে না তো?

প্রসাদ ঈষৎ হেসে বললে—কেন রাগ করবার কি আছে

কল্যাণীর ঘাড়ে সস্নেহে হাত রাখল প্রসাদ....

বললে—কি বই রে কল্যাণী?

—বাবা হয়তো পড়তে অনুমতি দিতেন না

—হুঁ?

—Intelligent.....

—ওঃ, সে আবার কার বই?

—শ'য়ের

—শ?

—বার্নার্ড শ—

—ওঃ, নাটক বুঝি! তা বেশ, শ'য়ের নাকট মন্দ না; তবে—একটু গর্জন বেশি। তোমাদের মতন মেয়েদের পক্ষে না পড়াই ভাল।

প্রসাদ মুখ বিকৃত করে বললে—লিটারেচার ফিটারেচার ধার ধারি না আমি—ও বই দেখিওনি কোনও দিন চোখে। তোমার কাছে ছিল বুঝি? কিনেছিলে? কে দিয়েছিল—? মিনু? মিনু কে? কলেজের মেয়ে? ওঃ; মেয়েরা বুঝি এ সব খুব পড়ে? বোঝে কি? শ একটু শক্ত নয় কি? হার্ড নাট! কি বোঝে! তুই বুঝিস? আমরা বুঝি না—বড্ড [?] সেই এক গ্রুপে ঘুরছে—ঘুরছে—ঘুরছে—মাকড়সার মত; এই রকম না? মাকড়সা—মাকড়সা—উর্ণনাভ—উর্ণনাভ! অনাদ্যন্ত পৃথিবীর উর্ণনাভ নয়। বিশ শতকী England-এর প্রথম ওই দশকের—। লোকটা আজ মৃত। (কে জানে আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো আমাদের চেয়ে)

প্রসাদ ল' জার্নালে মন দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী বললে—বইটা তাহ'লে তুমি দেখনি?

—না

—আমার টেবিলে ছিল—কাল রাতেও ঘুমোবার আগে দেখেছি—আজ ভোরে পাচ্ছি না।

প্রসাদ বললে— কোথাও হয়তো অসাবধানে ফেলে রেখেছে—ভাল করে খুঁজে দেখ গিয়ে—যাও—আর বিরক্ত কোরো না।

কল্যাণী চলে গেল।

আস্তে আস্তে নিজের পড়ার ঘরের চেয়ারে এসে বসল সে। তার মনে হ'ল কাউকে সে আর অপরাধী স্থির করতে পারে না—কারুর বিরুদ্ধেই কোনোরকম নালিশ সে আর তৈরি করতে পারল না—সেরকম ভিত্তি সে কোনোদিকেই খুঁজে পেল না; দোষ তার নিজেরই; হয়তো এমন কোনো জায়গায় বইটা সে ফেলে রেখেছিল সেখান থেকে বাইরের লোক এসে নিয়ে যেতে পারে!

কোথায় সে ফেলেছিল? অনেকক্ষণ কঠিন চিন্তা করে মনে করতে চেষ্টা করল; কিন্তু মাথাটা তার তাকে একটুও সাহায্য করল না যেন। কল্যাণীর মনে হ'ল সমস্ত চিত্তবৃত্তিই যেন দিনের পর দিন তার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, অবনত হয়ে পড়ছে!—মেয়েরা যে বই বোঝে সে তা বুঝল না; পড়তে পড়তে হারিয়ে ফেলল; কোথায় হারিয়ে ফেলল তাও মনে করতে পারল না।

নিজের প্রতি ধিক্কারে তার মন ভরে উঠল।

কল্যাণীর মনে হ'ল পৃথিবীতে কাকে সে তৃপ্ত করতে পারবে? তাকে নিয়ে কেউ তৃপ্ত হবে কি? কি হবে পৃথিবীতে তাকে দিয়ে?

মিনুকে একখানা বই কিনে দিতে হবে।

কিন্তু এই বইখানার পাশে পাশে মিনুর যথেষ্ট নোট ছিল—সে নোটগুলো কোথায় পাবে সে? সেগুলো খুব মূল্যবান মন্তব্য; মিনু অনেক রাত জেগে জেগে অনেক বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করে লিখেছে; এ জন্য অনেক বইও ঘাঁটতে হয়েছে মিনুর-অনেক ভাবতে হয়েছে। এ সব কল্যাণী কি করে উদ্ধার করতে পারবে আবার?

ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কল্যাণী।

চৌদ্দ

বেলা এগারোটার সময় ঘুমের থেকে জেগে উঠে স্নান করতে গেল। আজকাল পঙ্কজবাবু চন্দ্রমোহনের খাতিরে দোতলায় একটা গোল টেবিলের চারদিকে সমস্ত পরিবারকে নিয়ে খেতে বসেন—

এ পদ্ধতিটা চন্দ্রমোহন শিখিয়েছে; প্রসাদ বলেছে 'মন্দ কি?' পঙ্কজবাবুরও বোধ হ'ল এ বেশ। এক গুণময়ী ছাড়া সকলেই দু'বেলা টেবিলে বসে খায়।

স্নান শেষ করে কল্যাণী এসে দেখল টেবিলে জায়গা তৈরি। ভিজে চুলে—একটুও না নিংড়ে—সিঁথিপাটি কিছুই না করে কল্যাণী খেতে বসল এসে।

চন্দ্রমোহন তাকিয়ে দেখল—এমন বিষণ্ন মুখ এ মেয়েটির আজ!

সমস্ত মাথার থেকে অনবরত টপটপ করে জল পড়ে ব্লাউজ শাড়ি সব ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছিল কল্যাণীর।

কিন্তু এক চন্দ্রমোহন ছাড়া সেদিকে আর কারুর লক্ষ্য ছিল না। পৃথিবীর কোনও কিছুকেই কল্যাণী আজ আর তার গ্রাহ্যের মধ্যে আনছিল না—একধারে বসে চোখ নত করে খেয়ে আস্তে আস্তে উঠে সে চলে গেল। নিজের ঘরে আরসীর সামনে গিয়ে ধীরে ধীরে চুল আঁচড়ে বেণী বেঁধে নিজের পড়ার টেবিলের পাশে এসে বসল সে।

চেয়ারে বসে ভাবল 'মিনুকে একখানা চিঠি লিখবে' সমস্ত কথা খুলে লিখবে সে; না জানি মিনু কি ভাববে?

ভাবতে গিয়ে কল্যাণী বড় মর্মাহত হয়ে উঠল।

মীরার কবিতার খাতা ঠিক আছে; চিতুর অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডও; সুপ্রভা যে বই দিয়েছে সেখানাও রয়েছে। ভাল করে দেখে নিল সব কল্যাণী। যে শুকনো গোলাপ ও ফার্নগুলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে ছিল মীরার খাতার ভিতর ধীরে ধীরে যত্ন করে গুছিয়ে রেখে দিল সব সে।

টেবিলটাই সকাল থেকে গুছিয়ে ছিল—

আরও একটু পরিপাটি করে গুছিয়ে সাজিয়ে ফেলল এখন। কল্যাণী ভাবল, দরকারী জিনিসগুলো এর পর থেকে ডেস্কের ভিতর চাবি বন্ধ করে রেখে দেবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ।

মেয়েদের বইখাতাগুলো এখনই ডেস্কের ভিতর রেখে দিল সে। রেখে দিতে দিতে ডেস্কের মধ্যে নিজে চিঠিপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখল—মনে হ'ল কে যেন এ সবও ঘেঁটেছে—দু'চারখানা চিঠিকে খসিয়েছে বলে মনে হল।

কিন্তু চিঠির তো কোনও তালিকা নেই তার কাছে—অনেক চিঠিই তো তার কাছে আসে—নিজের অবহেলায়ও চিঠি হারায় সে ঢের—অনেকগুলো রেখেও দেয় ডেস্কের ভিতর; এগুলোর ভিতর থেকে কেউ যদি আবার কিছু সরিয়ে নেয় বুঝে ওঠা বড় দুষ্কর কল্যাণীর পক্ষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ তার ব্যথা করছিল।

চোখ মাথা—এ সব আর খাটতে চায় না যেন।

কল্যাণীর মনে হ'ল চিঠি যদি কেউ নিয়ে থাকে—নিক্ সে; যা খুশি করুক গে; করবার নেই, বলবার নেই।

নিজের ডায়েরীটা বের করল সে।

মিনু তাকে ডায়েরী লিখতে শিখিয়েছে। এক বছর ধরে দিনের পর দিন লিখে আসছে কল্যাণী

—একটা মস্ত বড় মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতায় তারিখের পর তারিখ কত কি ঘটনা—কত কি দুষ্টুমি—ফুর্তি—মন্তব্য—মাঝে মাঝে এক আধটু ভালোবাসার কথা—মেয়েদের সঙ্গে, দু'একটা ছেলের সঙ্গেও অবিশ্যি।

কল্যাণীর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল।

দু'একটা আধ-ফোটা গোপন ভালোবাসার কথা মনে পড়ে গেল তার—ভাবতে লাগল—ডায়েরীটা টেবিলে রেখে—ডায়েরীর ওপর মাথা গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে—সে সব ছেলেরা আজ কোথায়? ছোড়দার সঙ্গে বোর্ডিংয়ে এসেছিল একটি একদিন; মামাবাবুর বাসায় আর একটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল; এই শালিখবাড়িতেও আর একজন রয়েছে—অবিনাশদা।

কিন্তু এ ভালোবাসাগুলো জমেনি—জমতে পারেনি তেমন; এদের সঙ্গে দেখা হয় কত কম। এত কম! বিধাতা এদের।

কে জানে অবিনাশদা এখন শালিখবাড়িতেও আছে কি না?

আছে হয়তো; পূজোর ছুটিতে এসেছে নিশ্চয়।

অবিনাশদার সঙ্গে এক দিন দেখা করতে যাবে সে—ছোড়দাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারপর ছোড়দাকে দেবে বিদায় দিয়ে। তারপর কথাবার্তার পর অবিনাশদা কল্যাণীকে তার বাসায় পৌঁছে দেবে। ডায়েরীতে অবিনাশের কথা মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প লিখে রেখেছে কল্যাণী। মিনু দেখতে চেয়েছিল—কিছুতেই দেখায়নি; নিজের ভালোবাসার কথাগুলো কাউকেই সে দেখায়নি।

কিন্তু এ হয়তো ভালোবাসাও নয়।

কে জানে ভালোবাসা কি না?

যাই হোক না হোক, সেই কল্‌কাতার ছেলে দু'টির চেয়েও অবিনাশকে তার নিকটতর মনে হয়। হয় না কি?

ডায়েরীতে অনেক কথা লিখবে আজ কল্যাণী।

ধীরে ধীরে ডায়েরীটা খুলল সে। কিন্তু খুলতেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কল্যাণীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন; এ কি ডায়েরীর মাঝখানের ক'টা পাতা (এমন করে) কাটা কেন? কে কেটে নিল? এ কি ভীষণ!

কল্যাণী সমস্ত-চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল যেন। ঘরের দরজা জানালা আটকে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। কি সে করবে? কি সে করতে পারে! এ ডায়েরীর কথা কাকে সে বলবে? ছি, ছি, ছি, ছি—

এ করে কি লাভ হ'ল তার?

তারপর বিতর্ক আর নয়। বালিশে মুখ গুঁজে নিঃসহায় শিশুর মতো প্রাণ ঢেলে কাঁদতে লাগল কল্যাণী।

বেলা তিনটের সময় ধীরে ধীরে চোখ মুছে আবার কিশোরের কাছে গেল সে। কিশোর তখনও লিখছিল—তার সেই নাটক।

কল্যাণী গিয়ে বললে—ছোড়দা—

গলা তার এত শান্ত—এত নরম—এত ব্যথিত যে কিশোর অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বললে—কি রে!

কল্যাণী বললে—ছোড়দা, কাউকে বলবে না একটা কথা।

কিশোর বললে—কেন বলব? আমার কাছে যা গোপন রাখতে চাও সে কথা তুমি আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না কল্যাণী।

কল্যাণী আশ্বাস পেয়ে বললে—ছোড়দা, সেই বইটে আমি কোথাও পেলাম না—হয়তো আমিই এমন জায়গায় রেখেছিলাম যে সেখান থেকে কেউ নিয়ে গেছে; তা হতে পারে।

কল্যাণী থামল

কিশোর বললে—আচ্ছা আমি খুঁজে দেখব

—জান ছোড়দা, আমি ডায়েরী লিখি—

—ডায়েরী লিখিস?

—হ্যাঁ

—কৈ, আমি তো জানি না—

—কাউকে আমি বলিনি—

কিশোর সমবেদনার খোরাক জুগিয়ে বললে—তা সত্যি, ঢেঁড়া পিটোবার জিনিস তো এ সব নয়; নিজের মনের যে সব কথা নিজেকে ছাড়া আর নিজের সখীদের ছাড়া আর কাউকে বলা চলে না তাই দিয়েই মানুষের ডায়েরী—মেয়েদের অন্তত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও অনেক সময় ভাবি ডায়েরী লিখব—কিন্তু মেয়েরা ছাড়া ও লিখতে পারে না। তাই নাটক লিখছি—

কিশোরের কথার ভিতর, তার গলায়, কোথাও কোনো উপহাসের সুর নেই; কল্যাণীকে কিশোর এমন সমর্থন করল, কল্যাণী এমন ভরসা পেল।

সে বললে—ছোড়দা, ডেস্কের ভিতর আমি আমার ডায়েরী রেখে দিয়েছিলাম—কাল রাতে লিখে রেখে দিয়েছি—ঠিকঠাক কোথাও কোনও গলতি নেই। আজ দুপুরে আবার ডেস্কের থেকে বার করে দেখি মাঝখানের দশ পনেরো পাতা কেটে কেটে নিয়েছে—

কিশোর অবাক হয়ে বললে—বলিস কি!

—সত্যি কেটে নিয়েছে ছোড়দা

—কেটে নিয়েছে মানে?

—কাঁচি দিয়ে কেউ কেটে নিলে যে রকম—তাই

কিশোর স্তম্ভিত হয়ে বললে—তা কি করে হয়!

—হয়েছে তো

—ইঁদুরে কাটেনি তো?

—তুমি দেখে যাও এসে ছোড়দা মানুষ আর কেউ কেটেছে কি না—

কিশোর কল্যাণীর সঙ্গে গেল—

ডায়েরীটা টেবিলের ওপরেই ছিল

কল্যাণী বললে—এই দেখ—

কিশোর ভ্রুকুটি করে দেখল কাঁচি বা ব্লেড দিয়ে কেটে নিলে যে রকম হয় ঠিক তাই। মানুষের হাতে কাটা—বেশ্ নিপুণভাবেও বটে।

বললে—এ কি অন্যায়!

কল্যাণী বললে—বিশেষ করে এই পাতাগুলো নিয়ে গেছে কেটে—

কিশোর বললে—ওগুলোতে কি ছিল?

—যাই থাক না কেন?

কিশোর বললে—তোর ডেস্কের ভিতর ছিল?

—হ্যাঁ

—মজা ছোড়দা?

—জঘন্য

কল্যাণী বললে—কি করা যাবে?

কিশোর একটু ভেবে বললে—যে নিয়েছে তাকে কিছুতেই ধরতে পারা যাবে না।

কেন?

—কাকে তুমি সন্দেহ করবে?

কল্যাণী অত্যন্ত কঠিনভাবে ভেবেও কাউকে সন্দেহ করতে পারল না।

কিশোর বিমুগ্ধ হয়ে দেখছিল সুন্দর পরিষ্কার হাতে প্রায় আড়াইশো তিনশো পৃষ্ঠা ভরে কল্যাণী কত কি লিখেছে!

কিশোর বললে—পড়ব কল্যাণী?

—পড়।

দু'এক পাতা উল্টে কিশোর বললে—থাক্।

ডায়েরীটা বন্ধ করে রেখে দিল কিশোর।

উঠে দাঁড়াল।

কল্যাণী বললে—কোথায় যাচ্ছ?

—লিখতে।

—আমার কি ব্যবস্থা হ'ল?

কিশোর চোখ মুখ হাত রগড়ে একটা হাই তুলে বললে—কিছু তো আমি ভেবে বের করতে পারছি না। যখন কাটছিল তখন যদি ধরা যেত তাহ'লে প্যাদানো যেত—কড়িকাঠের সঙ্গে লটকে দিতাম—কিন্তু এখন করতে পারা যাবে না কিছু। কাকে সন্দেহ কর তুমি।

কিশোর এক পা দু'পা করে হাঁটতে লাগল—

কল্যাণী বললে—তা'হলে আমাকে চোখ বুঁজে এ অত্যাচার সহ্য করতে হবে?

—কেউ যদি বলে তুমি নিজে কেটেছ—?

কল্যাণী সে কথা অগ্রাহ্য করে বললে—তাহ'লে তোমরাও এ বাড়ির কেউই আমার কোনো উপায় করে দিতে পারবে না।

কিশোর বললে—এখন থেকে চাবি বন্ধ করে রেখে দিস

—কিন্তু সম্প্রতি যা সর্বনাশ হয়েছে তা মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–detective লাগাতে পারিস। বাংলাদেশে তা পাবি কোথা? এ দেশে কচুর শেকড় আর ঘেঁটুফুল ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। করবি কি।

কিশোর চলে গেল

কল্যাণী কাঁদতে লাগল।

ডায়েরীর এক একটা পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল; এত বড় অন্যায়ের কেউ কোনও প্রতিকার করতে পারবে না, এ কেন হবে?

জীবন বিধাতা বললেন; এ ডায়েরীটা তুমি ছিঁড়ো না কল্যাণী, এতে আমার ব্যথা লাগে!

কিন্তু তবুও পাতার পর পাতা ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলতে লাগল মেয়েটি।

পনেরো

সন্ধ্যার সময় আজো সকলে হরিচরণ চাটুয্যের হাবেলীতে যাত্রা দেখতে চলে গেল—পঙ্কজবাবু পর্যন্ত।

কল্যাণীও ভেবেছিল সে যাবে।

কিন্তু বিকেলের ডাকে মিনু ও মীরার বেশ বড় দু'খানা চিঠি এল।

কল্যাণী তক্ষুণি জবাব লিখতে বসল। চিঠিতে একবার হাত দিলে না শেষ করে ওঠে না সে। লিখতে লিখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—ওরা গেল চলে।

ওসমানকে চিঠি পোস্ট করতে দিয়ে কল্যাণী তেতলার বারান্দায় একটু পায়চারি করতে গেল—হাতে সুপ্রভার বইখানা! দি রেড লিলি।

বারান্দায় পা দিয়ে দেখল চন্দ্রমোহন একটা সোফার ওপর বসে আছে।

এ লোকটার কথা সারারাত ভুলে ছিল কল্যাণী; পৃথিবীতে যে এ মানুষটি আছে তাও মনে ছিল না।

একে দেখেই সে পিছিয়ে শটকে যাচ্ছিল—কিন্তু চন্দ্রমোহনের হাতের বইটার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী—

চন্দ্রমোহন বললে—ওঃ আপনি!

একটু কেশে বললে—আপনিও বুঝি যাত্রা দেখতে ভালোবাসেন না? বেশ বেশ।

চন্দ্রমোহন তার হাতের বইটা ধীরে ধীরে বন্ধ করলে—

বললে—ওঃ বসেছেন। বেশ বেশ। আমিও ভাবছিলাম বই না পড়ে কথাবার্তা বললেই বেশ লাগবে।

চন্দ্রমোহন কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বললে—আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে বাঙালির ঘরে এ রকম রূপ থাকতে পারে; কিন্তু থাকে বাঙালির ঘরেই। শিল্পীরা এ জন্যেই বাঙালি মেয়ে বিয়ে করবার জন্য পাগল।

কল্যাণী বললে—আপনার হাতে ওটা কি বই?

—এটা?

—হ্যাঁ

—এই বইটা—

চন্দ্রমোহন বইটার শিরোনামের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে—এটা হচ্ছে An intelligent.....

কোথায় পেলেন এ বইটা?

—এই সোফার ওপরেই ছিল।

—বই সোফার ওপরে?

—হ্যাঁ

—ঠিক মনে আছে আপনার?

চন্দ্রমোহন বললে— বাঃ।

কল্যাণী বললে—কখন পেলেন?

—এই তো এক্ষুণি এসে—

এই এসে পেলেন?

হ্যাঁ, কে যেন ফেলে গিয়েছিল, আপনি হয়তো?

কল্যাণী নিস্তব্ধ হয়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল—

চন্দ্রমোহন বললে—এ এক রকম বই, না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু; না আছে কোনো মনে। এ সব বই মানুষের পড়া উচিত নয়—

কল্যাণী বললে—সোফার ওপর এ বই কে এনে রাখল? আমার যদ্দুর মনে পড়ে আমি তো সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম; কাল রাতে ঘুমোবার আগেও টেবিলে বসে পড়েছি বইখানা—সকালে দেখি কোথাও নেই—

চন্দ্রমোহন বললে—আপনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন—এইখানেই রেখে গিয়েছিলেন—এ রকম ভুল হয় মাঝে মাঝে—আমাদের সকলেরই হয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী বললে—এ বারান্দাও তো আমি পঁচিশবার করে দেখে গেছি—সোফায়ই যদি থাকবে তাহ'লে আমার চোখে পড়ল না কেন?

চন্দ্রমোহন বললে—পড়েনি তো।

একটু পরে বললে—একটা সামান্য বই কোথায় ছিল না ছিল এ নিয়ে মানুষের বক্তব্য বেশিক্ষণ চলতে পারে না।

কল্যাণী ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল।

চন্দ্রমোহন বললে—আসল কথা হচ্ছে এ বই আমাদের পড়া উচিত নয়—

কল্যাণী বললে—নাই বা পড়লেন।

—না, পড়ব না আমি।

—দিন বইটা।

চন্দ্রমোহন কল্যাণীকে বইটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে— আপনার বেশ ভালো লাগে?

কল্যাণী কোনো জবাব দিল না।

চন্দ্রমোহন বললে— আমি ব্যবসায়ী হয়েও প্রেমিক হয়েছি, প্রেমিক হয়েও মাস্টার হতে পেরেছি—বলে সে একটু হাসল।

পরে বললে—এখন একটু মাস্টারী করা দরকার—প্রেম না হয় আর এক সময় হবে।

কল্যাণী উঠে দাঁড়াল।

চন্দ্রমোহন বললে—শুনুন

—কিছু শুনবার নেই—

কল্যাণী চলে যাচ্ছিল—

চন্দ্রমোহন বললে—কথা আছে শুনুন—আপনার বাবা—

কল্যাণী এক নিমেষের জন্য দাঁড়াল—বাবার কথা এ আবার কি বলতে চায়?

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার বাবা আর আমি কাল আপনার কাছে গিয়েছিলাম—

—আমার বাবা?

—হ্যাঁ আপনার বাবা আর আমি

—আমার কাছে গিয়েছিলেন বাবা!

—হ্যাঁ

—কখন?

—কাল রাতে।

—কোথায়?

—আপনার ঘরে

কল্যাণী বিস্মিত হয়ে বললে রাতে আমার ঘরে—কখন?

একটা সোফার ওপর বসল সে।

চন্দ্রমোহন বললে—তখন আপনি ঘুমুচ্ছিলেন—

কল্যাণী স্তম্ভিত হয়ে বললে—বাবা তখন আমার ঘরে ঢুকেছিলেন আপনাকে সঙ্গে করে?

—হ্যাঁ

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকিয়ে রইল।

চন্দ্রমোহন বললে—বিশ্বেস হয় না বুঝি?

কল্যাণী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চন্দ্রমোহনের দিকে চেয়ে রইল।

চন্দ্রমোহন বললে—একটা দরকারী কথার প্রসঙ্গে গিয়েছিলাম—

সে কথা কল্যাণীর কানে গেল না, অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সে বললে—আমার বাবা আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—হুঁ

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার টেবিল নেড়ে চেড়ে দেখলেন আপনার বাবা।

—আমার বাবা? কল্যাণীর শরীর মন নিঃশ্বাস ফেলতে চাইছে না যেন আর।

—হ্যাঁ, এই বইটেও তিনি নিয়ে এলেন

—এই বইটে?

—হ্যাঁ

—নিজের ঘরে গিয়ে পড়েছিলেনও বুঝি—পড়ে তার অত্যন্ত খারাপ লাগল—যাত্রা শুনতে যাবার সময় এই সোফার ওপর ফেলে গেলেন—আমাকে পড়তে বললেন। আমারও ভালো লাগেনি—আপনার টেবিলের সব বইগুলি তিনি দেখেছেন— বড্ড দুঃখিত হয়েছেন তাতে—

কল্যাণী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললে—আমি বিশ্বাস করি না। মিথ্যা কথা সব।

চন্দ্রমোহন বললে—আস্তে।

কল্যাণী তেমনি চীৎকার করে উঠে বললে—কক্ষণও না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রমোহন বললে—ছি

কল্যাণী বললে—না—না-না—আমার বাবা কিছুতেই নয়—মেজদা হতে পারে—ছোড়দা হতে পারে—মা হতে পারে—বাবা নয়—বলুন বাবা যাননি—বলুন—বলুন আপনি—

চন্দ্রমোহন বললে—যদি গিয়ে থাকেন, আপনার মঙ্গলের জন্য গিয়েছেন; তাতে খারাপ তো কিছু হয়নি।

কল্যাণী আড়ষ্ট হয়ে বললে—আমার মঙ্গলের জন্য?

—বাবা মা মঙ্গল ছাড়া আর কি চান?

—আমার ডায়েরী—

—আপনার ডায়েরীটাও দেখেছেন তিনি।

—বাবা?

—হ্যাঁ—কয়েক পাতা কেটেও রেখেছেন

কল্যাণীর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। যেন প্রবল প্রচণ্ড মেরুর শীত এসে ঘিরে ধরেছে তাকে।

চন্দ্রমোহন তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়েটির আপাদমস্তক দেখতে লাগল—দেখতে লাগল শুধু—

এই মেয়েটির কোনো মঙ্গল কোনো কল্যাণ কোনো ভবিষ্যতের চিন্তা তার মনের ত্রিসীমায়ও ছিল না—এর অভূতপূর্ব রূপও মুহূর্তের জন্য অর্থহীন হয়ে গেল চন্দ্রমোহনের কাছে—মন তার কেমন দুরন্ত গভীর ক্ষুধায় ভরে উঠল। হা, বিধাতা, কেমন একটা গভীর ক্ষুধায়!

কিন্তু প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে নিজেকে সংযত করে নিলে সে।

বললে—কল্যাণী তুমি কষ্ট পাচ্ছ—কেন এত কষ্ট পাও? আমি তোমাকে আমার প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি কল্যাণী।

নিজের সোফাটা এগিয়ে আনল চন্দ্রমোহন।

কল্যাণী আরক্ত চোখ মেলে হাত ইসারা করে চন্দ্রমোহনকে সরে যেতে বললে।

চন্দ্রমোহন নিতান্ত দ্বিধাহীন নিঃস্পৃহভাবে সরে গিয়ে আগের জায়গায় বসল আবার।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে সেখান থেকে সে চলে গেল; নইলে তার ক্ষুধাকে সে রাতে কিছুতেই সে জয় করতে পারত না।

ষোলো

পরদিন সকাল বেলা।

পঙ্কজবাবু বললেন—হ্যাঁ গিয়েছিলাম বটে—

কল্যাণী বলল—পরশু রাতে?

হ্যাঁ—

—আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম—

—তুমি ঘুমিয়েছিলে—

—তখন কেন গেলে বাবা?

—দরকার ছিল।.

চন্দ্রমোহনবাবুকেও সঙ্গে নিয়েছিলে?

-হ্যাঁ

কল্যাণী বিহ্বল হয়ে বললে—ওকে নিলে কেন?

—কি হয়েছে তাতে।

কল্যাণী হতাশ হয়ে বললে—বাবা!

চন্দ্রমোহনকে আমি আমার ছেলের মত মনে করি—

—তোমার ছেলের মত!

—হ্যাঁ, বিজলীর থেকে ভালো নয় কি?

—বড়দার থেকে ভাল?

ঢের—ঢের—ঢের—ঢের ভাল।

কল্যাণী দু'এক মুহূর্ত নিঃশব্দ হয়ে রইল।

পঙ্কজবাবু নীরবে চুরুট টানতে লাগলেন—

কল্যাণী বললে—আমার টেবিলের বইগুলোও দেখেছিলে তুমি?

—হ্যাঁ; ও রকম বই কেন তুমি পড়? ওসব বই কে তোমাকে দেয়? ফরাসী ডিকাডেন্সের ভগবানহীন সংযমহীন নরমাংসের নারীমাংসের নরককুণ্ডের বই সব—কে তোমাকে দেয়? কোত্থেকে পাও?

কল্যাণী এ বিশেষণগুলোর একটিরও কোনো মানে বড় একটা বুঝল না; সুপ্রভা অবিশ্যি কয়েকখানা ফরাসী উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ তাকে দিয়েছিল; কিন্তু সেগুলো কল্যাণী পড়তে পারেনি—বোঝেনি—দু'এক পাতা দু'এক পাতা পড়ে কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয়নি তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে নীরব হয়ে রইল।

আহা, বেচারী, কল্যাণী,—সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—আর্টের সঙ্গেও না; যাদের কিছু আছে—তারা কয়েকখানা বই দিয়েছিল তাকে; সেগুলোর সুন্দর সুন্দর মলাট বাঁধাইয়ের চমৎকার কারুকার্য দেখে নিজের টেবিলের ওপরে রেখেছিল মেয়েটি—নিতান্তই টেবিল সাজাবার জন্য। আর্টের কি বোঝে সে? সাহিত্যের কি জানে? জীবনের কি বোঝে?

জীবনের কাছে সে ঢের ঢের নিরপরাধ—পঙ্কজবাবু বা গুণময়ীও কোনোদিন ততখানি ছিলেন না।

পঙ্কজবাবু না বুঝে মেয়েটিকে অপরাধী সাজিয়ে আর্ট ও সমালোচনার থেকেও একেবারে ছিটকে গিয়ে জীবনের নানা রকম স্থূলতার কথা বলতে লাগলেন—নিজে ব্যাহত হতে লাগলেন—মেয়েটিকে মর্মান্তিক ব্যথা দিতে লাগলেন।

পঙ্কজবাবু বললেন—তোমার ডায়েরীও দেখলাম; ও সব কি লিখেছ তুমি? আমাকে ভুল বুঝিয়েছ এতদিন বসে। তারিখের পর তারিখ মিলিয়ে দেখলাম বায়োস্কোপ দেখেছ—সারকাস দেখেছ—কার্নিভালে গিয়েছ—লাকি সেভেন খেলেছ—সোডা পাউন্টেনে গিয়েছ—তুমি থিয়েটার অব্দি দেখেছ-কল্যাণী ওই কিশে বাঁদরটার সঙ্গে আর বাড়িতে আমাকে চিঠি লিখেছ আমি কিছু দেখি নি—এ তোমার কি অদ্ভুত অন্যায় বল দেখি কল্যাণী।

কল্যাণী কেঁদে ফেলল।

পঙ্কজবাবু বললেন—শুধু কি তাই? মেয়েদের সঙ্গে কত কি অনাচার কর তুমি বোর্ডিঙে—

পঙ্কজবাবু একটু থেমে বললেন—এই বিধাতাহীন সংসহীন নরমাংসের নারীমাংসের বইগুলো পড়ে এই রকমই তো হবে—কোন মেয়ে তোমাকে চুমো দিল তাই নিয়ে তুমি কবিতা করতে আরম্ভ করলে—চারদিককার ডিকাডেন্সের শয়তান আর্টিস্টদের মত—কি উৎকট!

কল্যাণী অতসত কিছু বুঝল না; বুঝল এইটুকু যে সে উদঘাটিত হয়ে গেছে—সে যা সহজ মনে স্বাভাবিকভাবে সৌন্দর্যের সঙ্গে করেছে—যে জিনিসকে মানুষের প্রশংসা করা উচিত বলে মনে হয়েছে তখন তার—বাবা তার ভিতর পৃথিবীর পাপ ঢুকিয়ে দিলেন; আর সে যা করেনি, যে সবের নাম শোনেনি, যা বোধ করেনি, সেই সবও বাবা তাতে আপত্তি করলেন। সে যদি পারত—তা হলে অনেক কথা বলত বাবাকে—যার পর বাবা তাকে আর অভিযুক্ত করতে পারতেন না, রাগ করতে পারতেন না তার ওপর আর। কারণ, মন তার জানে, খুব ভালো করেই জানে যে বাবা যা চান—তার নিজের মনও ঠিক তাইই চায় এবং তাইই সে করে এসেছে; যেখানে এক আধটু ব্যতিক্রম হয়েছে তা তার দোষ নয়—অপরের দোষে— অপরেরও দোষে নয়—কে জানে কার দোষে!

কার দোষ জানে না কল্যাণী। কিন্তু দোষটা মানুষের অজ্ঞানতার ও সময়ের ভবিতব্যতার।

কল্যাণী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ভাবছিল; বাবা কেন এ সব বুঝবেন না?

কিন্তু বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতাও তার একটু ছিল না।

পঙ্কজবাবু বললেন—যাক।

তিনি চুরুট জ্বালাতেন।

'ওসব বই মেয়েদের ফিরিয়ে দিও।'

কল্যাণী শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে বলল—দেব।

—আর ডায়েরীটা পুড়িয়ে ফেলো

—ছিঁড়ে ফেলেছি

—সমস্ত

—হ্যাঁ

—বেশ ভালোই হয়েছে।

পরে বললেন—আর ওরকম লিখো না।

কল্যাণী বুঝতে পারছিল না যে তার কবিতা বা আর্টই শুধু নয়—তার ভিতরের জীবন স্বপ্ন ও আরাধনা সাধনা ও সৌন্দর্যের জীবন তার দিনের পর দিন ঐ লেখার ভিতর দিয়ে ফলে উঠছিল তার। বাবাকে সে বললে আর কোনোদিনও ঐ সব লিখতে যাবে না সে।

কল্যাণী বললে—আমি বুঝতে পারিনি যে এসব লেখা খারাপ—এর ভেতর অন্যায়। কি যেন বললে তুমি বাবা বিধাতাহীন সংযমহীন নরমাংসের নারীমাংসের—

পঙ্কজবাবু কল্যাণীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—না—না—না—তা নয়; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সব দিকে যায়।

কিছুক্ষণ ধরে নীরবে চুরুট টেনে পঙ্কজবাবু বললেন—এখন কাজের কথা কল্যাণী—কল্যাণী বাবার দিকে তাকাল—

পঙ্কজবাবু বললেন—পরশু রাতে তোমার কাছে গিয়েছিলাম আমরা—আরো একটা দরকারে—

পঙ্কজবাবু চুরুটার দিকে একবার তাকালেন—খানিক্ষণ বসে।

তারপর বললেন—তুমি কি কাউকে ভালোবাসা?

কল্যাণী মুখ নত করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঙ্কজবাবু বললেন—কোনো ছেলে ছেলেছোকরাকে? কলকাতায়?

কল্যাণী অধোমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল।

—বাসনি তাহ'লে। আমিও তাই ভেবেছিলাম। সে বেশ, সে খুব ভালো কথা। কলকাতায় কলেজেটলেজে পড়ে মেয়েরা অনেক সময় অনেক নির্বোধের মত কাজ করে ফেলে—

পঙ্কজবাবু বললেন—যাক, তুমি সে সবের থেকে ত্রাণ পেয়েছ।

কল্যাণীর মনে হ'ল ভালোবাসার থেকে তাঁর মেয়ের ত্রাণ চাচ্ছেন বাবা—বেশ তাই হোক—যথেষ্ট বিরুদ্ধাচার করা হয়েছে বাবার সঙ্গে, নিজের ভালোবাসার কথা বলে বাবাকে আর সে পীড়িত করতে যাবে না; নিজের ভালোবাসা তার নিজের মনের নিস্তব্ধতার ভিতরেই থেকেই যাক—হয়তো ভালোবাসাও পাপ, অন্তত বাবা যদি ডায়েরীর মত সেটা উদঘাটিত করতে পারেন তা হলে নিশ্চয় তা পাপ হবে—বিধাতাহীন সংযমহীন নরমাংসের নারীমাংসের জিনিস হয়ে দাঁড়াবে তা; কিন্তু নিজের মনের গোপনে তা এখন পাপ নয়—ভুল নয়—ভয় নয়—পৃথিবীর নানা দিককার নিঃসঙ্গতার ভিতর কেমন একটা ক্রমায়াত দীপ্ত অবলম্বের জিনিস।

পঙ্কজবাবু বললেন—তারপর আমাদের জমিদারীর যা অবস্থা-দিন দিন দেনা বেড়ে যাচ্ছে শুধু—তোমার দাদাকে বিলেত পাঠিয়ে আমাদের খোয়ারের এক শেষ হয়েছে।

কল্যাণী বললে—বদড়ার চিঠি পেয়েছ বাবা?

মেয়ের কাছে সে সব জিনিস চাপা দিয়ে যেতে চাইলেন পঙ্কজবাবু। কিছু বললেন না।

কল্যাণী বললে—আমাদের কাছে চিঠি লিখে না কেন বড়দা?

পঙ্কজবাবু কোনো উত্তর দিলেন না।

কল্যাণী বললে—মার কাছেও লেখে না।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। আরো কিছুটা সময় নিস্তব্ধতায় কেটে গেল।

কল্যাণী বললে—বড়দা আসবে কবে? আমাকে এসে কত বড় দেখবে, না বাবা?

যখন চলে গিয়েছিল বড়দা, আমি তখন ফ্রক পরতাম—

পঙ্কজবাবু বললেন—জমিদারীর তো এই অবস্থা—এক এক সময় মনে হয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসে তুলে দেই—

কল্যাণী চমকে উঠল।

বললে—না বাবা তা দিতে হবে না।

—বলা যায় না, কিশোরকে দিয়েও কিছু হবে না; যা এক প্রসাদ। সে যদি রাখতে পারে তা হ'লে থাকবে—না হ'লে আমার আর কিছু করবার নেই। আমার কিছু সাধ্য নেই আর—

কল্যাণী অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে বললে—আমি ছেলে হলে তোমার ঢের উপকার করতে পারতাম বাবা—

পঙ্কজবাবু বললেন—মেয়ে হয়েও কি পারা যায় না? খুব পারা যায়। করবে?

কল্যাণী খুব উৎসাহ গর্ব অনুভব করে বললে—আমি খুব পারব।

সে ভেবেছিল তাকে বুঝি আর বায়োস্কোপ দেখতে হবে না, সার্কাস থিয়েটারে যেতে হবে না, ডায়েরী লিখতে হবে না। ভালোবাসাতে হবে না; এই সব। এই সব বিরতির কাজ করতে বলবে বাবা তাকে হয়তো; করবে সে—বাবার এই সব নির্দেশ সজ্ঞানে পালন করবে।

গুণময়ী এলেন—

পঙ্কজবাবু বললেন—তোমাকে দেখে চন্দ্রমোহনের খুব ভালো লেগেছে—আমার কথা শুনছ কল্যাণী।

চুরুটে টান দিয়ে বললেন—ছেলেও খুব সৎ—ওদের পারিবার জানি আমি; ওকেও জানি।

কল্যাণীর বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছিল।

পঙ্কজবাবু বললেন—টাকাও ঢের—আমাদের মত দু'দশটা জমিদারী কিনে ফেলতে পারে—ওখানে গিয়ে তোমার সুখ হবে—সব দিক দিয়ে মঙ্গল হবে।

কল্যাণীর নিঃশ্বাস আটকে আসছিল—

সে ডুকরে কেঁদে উঠে বললে—কি বল তুমি বাবা!

পঙ্কজবাবু বললেন—চন্দ্রমোহন তোমাকে বিয়ে করতে চায়—আমিও চাই তুমি তাকে বিয়ে কর—তোমার মাও তাই চান—তোমার মেজদারও অমত নেই।

কল্যাণী কাঁদতে কাঁদতে তর্জন করে উঠে বললে—বল কি তোমরা সব? মেজদা বিয়ে করবে, না তুমি করবে? তবে যে বড় বলছ! ঐ উল্লুকটাকে বিয়ে করব আমি? আমার বাপ হয়ে তুমি এই কথা বলতে সাহস পাও? আমি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব তবু ওই বাঁদরটাকে বাঁদর ছাড়া আর কিছু বলতে পারব না। বাঁদর উল্লুক কোথাকার! এত বড় কথা বলে।

আকাশ-পাতাল ভাসিয়ে অসাড় অবোধ হয়ে কাঁদতে লাগল কল্যাণী।

পঙ্কজবাবু স্থিরভাবে চুরুট টানছিলেন—

একটি চুরুট তাঁর ফুরিয়ে গেল—আর একটি তিনি নিলেন; আস্তে আস্তে জ্বালালেন।

যেমনি টানছিলেন—টেনে যেতে লাগলেন।

গুণময়ীও এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণময়ী বললেন—ওর যদি না ইচ্ছে করে, তবে আর মিছেমিছে এ দিয়ে কি দরকার; চন্দ্রমোহন ছেলে ভালো বটে—কিন্তু মেয়েরও তা একটা রুচি অভিরুচি থাকে—তাও তো দেখতে হয়।

পঙ্কজবাবু বললেন—আমি সব জানি, আমি সব বুঝি। কল্যাণীকে স্থির হতে দাও। নানারকম বই পড়ে সঙ্গে মিশে ওর মনের ভিতর জিলিপীর পাক আর অমৃতির প্যাঁচ। বয়সও কম—নিজের মনটাকে ধরতে পারছে না তাই। আমাদের কাছে থাকলে শান্ত সুস্থির হয়ে ভাবতে পারবে, নিজের মনের কথা টের পাবে—তখন বুঝবে—বুঝবে সব।

কল্যাণী ধীরে ধীরে মাথা তুলল—

পঙ্কজবাবু বললেন—চন্দ্রমোহনের সম্বন্ধে ও তো কিছু জানে না—

কল্যাণী বলল—আমি জানতে চাই না বাবা—

পর মুহূর্তেই বললে—যথেষ্ট জানি ঐ উল্লুকটার সম্বন্ধে আমি; চাটগাঁয়ের মগের মত মুখ-হলদে রং; চোখ দুটো কুত কুত করে—সমস্ত মুখে আঁচিল আর দাড়ি—

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে কল্যাণী

গুণময়ী বললেন—ছি!

—আর বোলো না মা—

—কে বলছে তোমাকে যে চন্দ্রমোহনকেই বিয়ে করতে হবে তোমার

কল্যাণী মায়ের কাছ থেকে এই সান্ত্বনাটুকু পেয়ে ধীরে ধীরে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে একটু শান্ত হয়ে বসল। মনটা তার এখন খানিকটা ভালো লাগছে,

গুণময়ী বললেন—তোমার বাবা তো বলেননি চন্দ্রমোহনকে তোমার বিয়ে করতে হবে; তবে একটু ভেবে দেখতে বলেছেন; তোমার ইচ্ছা যদি হয়—তা হ'লে তুমি করবে—পাত্রটিকে আমাদের খুব ভালো মনে হয়—আমরা তোমার মঙ্গল চাই—

গুণময়ী থামলেন।

পঙ্কজবাবু কোনো কথা বলছিলেন না।

গুণময়ী বললেন—তাড়ার কিছু নেই; তোমাকে যে এখুনি করতে হবে এমন কিছু নয়। তুমি আমাদের কাছে থাক—শান্ত হয়ে ব্যাপারটা ভাব। ধা করে একটা মতলব করে বোসো না। তোমাকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে বলে ওমনিই যে তুমি মত দিয়ে বসবে—তাও আমরা চাই না—কিম্বা চন্দ্রমোহনকে উল্লুক বাঁদর বলে গাল দিয়ে তাড়িয়ে দেবে সেটাও ঠিক কথা নয়—একটু স্থিরভাবে ভেবে দেখ কল্যাণী—

কল্যাণী বললে—মা আমি ভাবতে পারি না কিছু—এ আমি কল্পনাও করতে পারি না—

—ওই তো, ছি ছি ছেলেমানুষী করতে হয় না—গুণময়ী বললেন—

পঙ্কজবাবু চুরুট টানছিলেন—

গুণময়ী বললেন—তোমার বাবা—আমি—আমার সংসারের ঢের দেখেছি; অনেক কিছু জানি শুনি—বুঝি—আমরা ভেবে যা বলি তার একটা মূল্য আছে। আমাদের নির্দেশ শুনলে তোমার ভুল হবে না। কিন্তু তবুও তোমার মতামতের স্বাধীনতা দেব আমরা। তুমি যা ভাল বোঝ তাও আমরা শুনব—

কল্যাণী বললে—আমি এই ভালো বুঝি যে চন্দ্রমোহনবাবুর কথা ভাবতে গেলেও আমার অন্নপ্রাশনের নাড়ীশুদ্ধ প্যাঁচ খেতে থাকে—তার চেয়েও মৃত্যু আমার ঢের ভালো মনে হয়।

কেউ কিছু বললেন না।

কল্যাণী বললে—বাপরে, কি ভীষণ! কলকাতার থেকে এসে দেখি একটা মগের মত একটা বাঁদরের মত দোতলার ঘরে বসে আছে—একটা ছাগলের মত আমার দিকে তাকাচ্ছে—আমার সমস্ত শরীর ভয়ে ঘেন্নায় ব্যথায় কাঁটা দিয়ে উঠল—আর তাকে নিয়েই কিনা এত দূর! বাপরে, বাপরে, বাপরে, বাপরে—

গুণময়ী বললেন—তুমি বড় অস্থির হয়ে ওঠো কল্যাণী—

—হব না? তোমরা ভেবে দেখেছ কি ভয়ঙ্কর কথা তোমরা বলেছ আমাকে—

গুণময়ী বললেন—চা খেয়েছিলি?

—না

—দুধ? ওভালটিন?

—না

—কিছু না

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে বললে—না, আমার খেতে ইচ্ছে করে না কিছু—

গুণময়ী বললে—নে, নে, আর একটু দুধটুধ খেয়ে যা।

কল্যাণী বললে—আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না মা।

গুণময়ী বললে—চল চল না খেলে বাঁচবি কি করে?

মায়ের পেছনে পেছনে বাঁচবার আয়োজন করতে অবশেষে গেল সে—এখন খানিকটা শান্ত স্থির হয়েছে তার মন—চন্দ্রমোহনকে বিদায় দিয়ে দিয়েছে একেবারে সে—পৃথিবীটা আবার আনন্দ ও উপভোগের জায়গা বলে বোধ হচ্ছে কল্যাণীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব চমৎকার বেলের পানা খেল কল্যাণী—এক বাটি ক্ষীর খেল—চার পাঁচটা চাট্টিম কলা পাউরুটি আর মাখন খেয়ে কিশোরের সঙ্গে লুডো খেলতে বসে দিনটাকে তার পৃথিবীর একটি নিত্য স্বাভাবিক দিনের মত—তার সমস্ত অতীত জীবনের সমস্ত দিনের মত অঢেল সুন্দর নৈসর্গিক মনে হতে লাগল।

কিন্তু সন্ধ্যায় অন্যরকম।

প্রসাদ আর চন্দ্রমোহন পঙ্কজবাবুর বগি গাড়িতে করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে গেছে; কিশোরও ছিল না।

তেতলার বারান্দায় তিন জন শুধু—পঙ্কজবাবু, কল্যাণী, গুণময়ী—

পঙ্কজবাবু বললেন—সারাদিনটা কি করলে কল্যাণী?

কল্যাণী সহসা কোনও উত্তর দিতে পারছিল না।

একটু পরে বললে—ঘুমিয়েছি—পড়েছি—

—কি পড়েছ?

—কলেজের বই

পঙ্কজবাবু একটু হাসলেন; কেমন যেন উদাসীন ভ্রুক্ষেপহীন একরকম হাসি। কল্যাণীর মনে হ'ল বাবা পড়াশুনার কোনও মূল্যই দিলেন না। এইরকম করে অবজ্ঞা করে হাসলেন—

পঙ্কজবাবু বললেন—এখন মনটা একটু স্থির হয়েছে তোমার?

কল্যাণী এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

পঙ্কজবাবু বললেন—শান্তভাবে ভেবে দেখলে ব্যাপারটার ভিতর কিছু অমঙ্গল পাবে না তুমি। তোমার মার কাছে যেমন, আমার কাছে যেমন—আশা করি তোমার কাছেও তেমনি জিনিসটা কল্যাণের জিনিস বলে মনে হয়েছে—

কল্যাণী বললে—কি জিনিস?

পঙ্কজবাবু উত্তর দিতে একটু দেরী করলেন—

পকেট থেকে চুরুট বের করলেন—

চুরুট নিয়ে খেলা করলেন—

পরে চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—চন্দ্রমোহনের সঙ্গে আজো আমার কথা হয়েছে; সে আর আপেক্ষা করতে পারে না। তাকে যা হয় একটা কথা দিতে হবে আমাদের—তা খুব তাড়াতাড়ি—

কল্যাণী বললে—কথা দিয়ে দেও যে আমি তাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

পঙ্কজবাবু একটু হেসে বললেন—অত সহজে কি কিছু হয়—

কল্যাণী বললে—আমার তা হয়—

একটু থেমে বললে—যদি হবার হ'ত, এত কথা বলতে হত না তো তোমাদের। ঢের আগেই হয়ে যেত। আমি কি বুঝি না তোমাদের কত হেনস্থা হচ্ছে? সে জন্য আমার খুব খারাপ লাগে, কিন্তু তবুও ওকে সরে যেতে বলা ছাড়া আর উপায় নেই। আমার সামনে ওকে বেরুতেও বারণ করে দিও তোমরা—আমি টেবিলে গিয়েও আর খাব না—

পঙ্কজবাবু ও গুণময়ী চুপ করে রইলেন—

খানিকক্ষণ নীরবে চুরুট টেনে পঙ্কজবাবু বললেন—কল্যাণী, যদি বুঝতাম তুমি বড় হয়েছ—তোমার মার মত ভাবতে শিখেছ তাহলে অন্য কথা ছিল—কিন্তু এখনও তুমি ঢের ছেলেমানুষ—

কল্যাণী ছটফট করে নেচে উঠে বললে—আমি ছেলেমানুষ নই; আমি ছেলেমানুষ নই। কে বলেছে আমি ছেলেমানুষ? কেন তোমরা এমন কথা বল? ও মা, বাবা কেন আমাকে ছেলেমানুষ বলে—আমি বুড়োমানুষের মত স্থির হয়ে ভেবে কথা বলেছি; আমার মনের ঠিক সত্য কথা বলেছি আমি। জোর করে আমাকে দিয়ে মিথ্যা বলিও না তোমরা—

গুণময়ী বললেন—আঃ, কল্যাণী থামরে।

স্বামীকে বললেন—আজ আর থাক।

পঙ্কজবাবু চুরুটের ছাই ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলে নদীটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুরুট টানলেন।

তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে খুব নরম সুরে ঃ কল্যাণী, তুমি তো বায়োস্কোপ দেখতে ভালোবাস, সারকাস থিয়েটারেও যাও, তোমার ছোড়দার সঙ্গে যে দু' একটি ছেলে মাঝে মাঝে তোমাদের বোর্ডিঙে যায়—তাদের দেখে তোমার মন একটু-আধটু চিড় খায় বৈকি—হয়তো ভাব এদের ভিতর কাউকে পছন্দ করলে জীবনের সঙ্গী করে নিলে মন্দ হয় না। একজন সঙ্গী স্বামী—তুমিও হয়তো কিছুদিন থেকে খুঁজছ—কিন্তু তবুও তোমার মনকে এখনও ভালো করে বোঝ নি তুমি। যে জিনিস এখন শরবর্তী স্বর্গ মনে হচ্ছে বাস্তবিকই তা সিদ্ধির নেশা। আমরা যে সব খুব জানি। এ সব বিষয়ে তোমার মা ও আমার অভিজ্ঞতার ওপর তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার। তোমার তাই করা উচিত। তাইতেই তোমার মঙ্গল। তুমি যাই বল না কেন, কল্যাণী, চন্দ্রমোহনকেই তুমি তোমার স্বামী বলে বুঝতে চেষ্টা কর। তাতে তোমার জীবন পয়মন্ত হয়ে উঠবে। আমি তোমার বাবা হয়ে—তোমার জীবনের পরম কল্যাণ কি তা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেই এই কথা তোমাকে বলছি—আমাকে তুমি অবজ্ঞা কোরো না।

কল্যাণী সারারাত বিছানায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা পাখির ছানা—যার বাপ মরে গেছে, মা মরে গেছে—চারদিককার দুর্বিসহ ভয় দুর্বলতা ও উপায়হীনতা ক্রমে ঘিরে ফেলেছে যাকে—এই মেয়েটির ধড়ের ভিতর যেন সেই আতুর অনাথ ছানার প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে; তাকে দেখবার বুঝবার গ্রহণ করবার জন্য কোথা কেউ নেই—কোনওদিনও যেন থাকবে না আর।

পঙ্কজবাবু বললেন—এই আমার ইচ্ছা প্রসাদ—তোমার মারও—

প্রসাদ বললে—হ্যাঁ, চারজন পার্টনার; ওদের ব্যবসার নাম আছে; খাতাপত্রখানা সঙ্গে এনেছিল—আমাকে দেখিয়েছে; যতটা বলে ততটা নয়—তবে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি টাকা আছে—কাঁচা টাকা অন্তত।

পঙ্কজবাবু বললেন—তা তো হ'ল—

প্রসাদ বললে—তাইতেই অনেক দূর হল বাবা—

—কিন্তু টাকাই তো সব নয়—ছেলেও খুব সৎ—চরিত্রবান ছেলে—সেই জন্যই আমার আগ্রহ খুব বেশি।

চন্দ্রমোহনের জীবনের এ দিকটা প্রসাদ বিশেষ কোনও কথাবার্তা বলতে গেল না, চুপ করে রইল।

পঙ্কজবাবু বললেন—তা'হলে তোমার মত আছে?

প্রসাদ বললে—কিন্তু বিয়ের খরচটা খুব সংক্ষেপে সারাই ভাল—কাঁচা টাকার মাল ওদের না হয় খুব আছে—ওদের মেয়েদের না হয় খুব ঘটা করে বিয়ে দেবে, কিন্তু আমাদের তো আর সেরকম অবস্থা নয়—

পঙ্কজবাবু অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন—আচ্ছা সে সব বোঝা যাবে—বোঝা যাবে—বিজলীর টাকা বন্ধ করবার পর বেশ একটু আয় দেখা দিচ্ছে—কিন্তু ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে না তো? কোনও চিঠিও লেখে না—একেবারে গুম যে!

প্রসাদকে নাক মুখ খিঁচতে দেখে পঙ্কজবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—কল্যাণীকেও আর বোর্ডিঙে পাঠাব না—তাতেও খানিকটা লাভ হবে—

পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে বললেন—আমি বলেছি, তোমার মাও বলেছেন—এখন তুমিও কল্যাণীকে বেশ একটু ভালো করে বুঝিয়ে বোলো—আমাদের চেয়ে হয়তো তোমার কথার শক্তি বেশি হবে—তুমি তার দাদা বলে সে হয়তো বেশ—

পঙ্কজবাবু চলে গেলেন।

প্রসাদ কথার লোক মাত্র নয়—কাজকেই সে ঢের ভালো বোঝে

কোর্টের থেকে ফিরে এসে একটু খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের পর প্রসাদ কল্যাণীর ঘরের দিকে গিয়ে বললে—কৈ রে কল্যাণী

কল্যাণী দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকার বিছানার ভিতর জড়সড় হয়ে পড়ে ছিল। মেজদার গলা শুনে তার যেন কেমন দিনের আলোর পৃথিবীটাকে মনে পড়ল—আশা ও সাধের সুদূর পৃথিবীটা এক মুহূর্তের মধ্যেই তার ঘরের কাছে এসে পড়ল যেন—

কল্যাণী ধড়মড় করে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে বললে—মেজদা! মেজদা—এসো।

—ঘুমিয়েছিলি?

—না

কি করছিলি অন্ধকারের মধ্যে একা বসে বসে

কল্যাণীর চোখে জল এল—

প্রসাদ বললে—এই বিকেল বেলাটা বুঝি এমনি করে মাটি করতে হয়!

প্রসাদ বললে—একদিন তো যাত্রাও দেখলি না? দেখেছিলি?

কল্যাণী ধরা গলায় বললে—না

—কেন না?

কল্যাণী চুপ করে রইল।

প্রসাদ কল্যাণীর ঘাড়ের ওপর হাত দিয়ে বললে—লক্ষ্মীপূজোর সময় আবার হবে—আমার সঙ্গে যাস্—আমি তোকে নিয়ে যাব।

কল্যাণী বললে—আমাকে নিয়ে যেও তুমি

—হ্যাঁ নিশ্চয় নিয়ে যাব

লক্ষ্মী পূজোর সময় হবে?

—লক্ষ্মী পূজোর সময়—শ্যামা পূজোর সময়; এখন দিয়ালিও দেখতে পারবি—একটা ট্যাক্সিতে করে—না হয় আমাদের বাড়ির গাড়িটায়ই যাওয়া যাবে বেশ। সমস্ত শহরটা ঘুরে আসা যাবে বোম পটকা আতসবাজী দেখতে দেখতে।

প্রসাদ হেসে উঠল—

কল্যাণী হেসে উঠল—

প্রসাদ বললে—চল, আজ একটু গাড়িতে করে বেড়িয়ে আসি

কল্যাণী আগ্রহের সঙ্গে বললে—কোথায়?

—নদীর পাড় দিয়ে ঘোরা যাবে—বেশ জ্যোৎস্না রাত আছে

কল্যাণী বললে—চল

—সাজগোজ কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাড়ী পরে এসে সে বললে—মেজদা, আর কেউ যাবে?

—না।

দু'জনে গেল।

গাড়ি খানিকটা চলল—

জ্যোৎস্না—নদী—মেজদার অনেক দিন পরে এমন স্নেহ—কল্যাণীর মন নানারকম ভরসা ও প্রসন্নতায় ভরে উঠল—

সে বললে—মেজদা—

প্রসাদ চুরুটে একটা টান দিয়ে বললে—কি রে—

—তোমাকে একটা কথা বলব আমি

—বল

—কিছু মনে কোরো না তুমি মেজদা—তোমাকে না বললে কাকে বলব আমি আর?

প্রসাদ কল্যাণীর পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে সস্নেহে বললে—কি কথা?

চন্দ্রমোহনের কথাটা আগাগোড়া সে বললে প্রসাদকে

প্রসাদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল—

কল্যাণী বললে—এ লোকটাকে তুমি তাড়িয়ে দাও মেজদা—

প্রসাদ চুপ করে তাকিয়ে ছিল দূর দুর্নিরীক্ষ্য শূণ্যের দিকে, কোনোও কথা বললে না।

কল্যাণী বললে—তোমার পায়ে পড়ি মেজদা, আমাদের বাড়ি একে আর ঢুকতে দিও না তুমি—ওর গলার স্বর শুনলেই আমার প্রাণ শুকিয়ে যায়—আমার এত কষ্ট হয় মেজদা

প্রসাদ বললে—কিন্তু শুনেছি লোকটার ঢের টাকা আছে

—অমন টাকার গলায় দড়ি—

—সে টাকা তারা সাধু উপায়ে রোজগার করেছে

—তা করুক

প্রসাদ একটু ঘাড় নেড়ে হেসে খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বললে—কিন্তু আমি যদি মেয়ে হতাম, চন্দ্রমোহনকে বিয়ে করতাম।

কল্যাণী অবাক হয়ে বললে—কেন?

—টাকার যে কি সুখ তা তুমি এখনও বোঝ নি কল্যাণী। কলকাতায় চন্দ্রমোহনদের রাজারাজড়াদের মত বাড়ি—সেখানে তার বৌ হয়ে বাড়ির পাটরানী হয়ে থাকা—সবসময় দাসদাসীর সেবা লোকজনের আদর সম্মান, যখন খুসি থিয়েটার বায়োস্কোপ সার্কাস—কত কি আমোদফুর্তি—সে সবের নামও জানি না আমরা। তারপর মধুপুরে বাড়ি—জামতাড়ায় বাড়ি—শিমলতলায় বাড়ি—দেওঘরে বাড়ি—দার্জিলিঙে বাড়ি—ওদিকে দেরাদূনে—আলমোড়ায়—নইনীতালে—এমন সুখ তুমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পার না কল্যাণী।

কল্যাণী হতাশ হয়ে বললে—মেজদা, তুমিও এই কথা বল?

—আমি ঠিকই বলি বোন, সব কথাই তোমাকে বলেছি—

কল্যাণী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ির পাদানের দিকে তাকিয়ে রইল—

প্রসাদ বললে—তুমি জান না হয়তো আমাদের জমিদারীর আর কিছু নেই

—কিছু নেই মানে?

—এখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলেই ভালো হয়

প্রসাদের হাত ধরে কল্যাণী বললে—ছি, অমন কথা বোলো না।

ধীরে ধীরে হাত খসিয়ে নিয়ে প্রসাদ বললে—না বলে কি করব? বাবার হাতে আর দু'বছরও যদি থাকে তাহ'লে আমাদের পথে নামতে হবে—

কল্যাণী অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে বললে—সত্যি বলছ তুমি মেজদা?

—দাদার ওপর ঢের নির্ভর করা গেছিল। কিন্তু দাদা দিলেন উল্টে আরো পগার করে সব। সে যাক, যা হয়ে গেছে তা গেছে, কিন্তু হবে তা আরো ভীষণ—

কল্যাণী পীড়িত হয়ে প্রসাদের দিকে তাকাল।

প্রসাদ বললে—দাদা আর ফিরবেন না, সে মন্দ নয়। কিন্তু ফেরেন যদি, দাবি করবে এ বাড়িটা হয়তো তাঁকে ছেড়ে দিতে হতে পারে- তাঁকে আর তাঁর মেমসাহেবকে—আর এড়িগেড়ি ট্যাশগুলোকে-

কল্যাণী বললে—সমস্ত বাড়িটা দিয়ে তিনি কি করবেন?

—মেমসাহেবরা সমস্ত বাড়ি না নিয়ে থাকে না—আমাদের সরে যেতেই হবে—কল্যাণী অত্যন্ত আশ্বাস ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললে—তখন তোমার কাছে গিয়ে থাকব আমি।

প্রসাদ একটু হেসে বললে—সে ক'দিন আর থাকতে পারবে তুমি? ক'দিন আর সম্মানের সঙ্গে সেরকম থাকতে পারবে তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কল্যাণী একটু আঘাত পেয়ে বললে—ভাইদের কাছে থাকতে গিয়ে অসম্মান কি করে হয় মেজদা?

প্রসাদ বললে—তা হয়—খুব—হয় [...] বিকার হয়—

কল্যাণী বিমূঢ়ের মত প্রসাদের দিকে তাকাল।

প্রসাদ বললে—তোমার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা চেপে যাওয়া উচিত নয় তোমার কাছে আমার। শুনতে খারাপ শুনালেও যা স্বাভাবিক—যেমনটি হয় যা ঘটবে তাইই তোমার জানা উচিত—আমারও খুলে বলা উচিত সব—

চুরুটে একটা টান দিয়ে প্রসাদ বললে—জমিদারী বলে আমাদের কারুর কিছুই থাকবে না, কোনও অংশ থাকবে না, সম্পত্তি না কিচ্ছু না—ওকালতি করেই আমাকে খেতে হবে; আমি বিয়েও করব—হয়তো শিগগিরই; জমিদারী তখন ফেঁসে গেছে—তুমি জমিদারের মেয়ে নও কিচ্ছু নও—আমার বৌ তখন তোমার ঘাড়ে হাগবে—খুব জোর দিয়ে এই কথাটা বললে প্রসাদ—সেটা তোমার কেমন লাগবে কল্যাণী?

কল্যাণী শিহরিত হয়ে উঠল।

প্রসাদ বললে—কিশোর পুরুষমানুষ আছে—একটা কিছু করেও নিতে পারবে হয়তো—তার জন্য তেমন ভাবনা নেই—কিন্তু তুমি কোথায় দাঁড়াবে?

প্রসাদ বললে—আর কিশোরও যে না বিয়ে করে ছাড়বে তা আমার মনে হয় না। তার ওখানে গিয়ে থাকলে তার বৌও তোমার ঘাড়ে হেগে বেড়াবে—

এর আর কোনও এপিঠ ওপিঠ নেই—

কল্যাণী বললে—গাড়িটাকে ফিরতে বল—

প্রসাদ গাড়োয়ানকে হুকুম দিয়ে কল্যাণীকে বললে—এই বেলা জমিদারের মেয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রমোহনকে তুমি বিয়ে করে নাও, না হ'লে পরে দুর্গতির আর শেষ থাকবে না তোমার।

কল্যাণী আঁতকে উঠল—

প্রসাদ বললে—তুমি মনে কর তুমি খুব সুন্দর। কিন্তু নির্জ্জলা সুন্দর মুখ দেখেই মানুষে আজকাল বড় একটা বিয়ে করে না। আমি নিজেও তা করব না। তোমার মতন এরকম সৌন্দর্য—এও অসাধারণ কিছু নয়—তুমি পঙ্কজবাবুর মেয়ে বলেই আজ এ জিনিসের একটা কিছু দাম আছে—চন্দ্রমোহনের স্ত্রী হলে এর দাম আরও হাজার গুণ বেড়ে যাবে। না হলে আমার কুচ্ছিৎ মাগ এলেও—সেই যা বলেছি—হৈ হৈ করে তোমার ঘাড়ে ঘাড়ে হাগবে—খুব সেয়ানা জিনিস হবে সেটা তখন, না?

আঠারো

শালিখবাড়িতে এসে অব্দিই অবিনাশ ভেবেছিল যে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে একদিন—কিন্তু যাওয়া তার ঘটে ওঠেনি।

সে অলস হয়ে গেছে—এত অলস যে যে সঙ্কল্পের পিছনে নরনারীর ভালোবাসার মত এমন একটা অনুপ্রেরনার জিনিস তাও যেন তাকে জোর দেয় না।

সে ঢের ভাবতে শিখেছে—

অনেক সময়ই বিছানায় শুয়ে থেকে ভাবে শুধু কোনও কাজ করে না, বিশেষ কারুর সঙ্গে কোনো কথা বলে না; এক একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি ঠাই বিছানায় শুয়ে থাকে—মাঝে গিয়ে একটু স্নান করে খেয়ে আসে শুধু—

ভালোবাসার কথা আজকাল সে বড় একটা ভাবে না—

এক এক সময় মনে হয় কল্যাণীকে আর ভালোবাসে সে কি?

এক সময় এই ভালোবাসা তাকে ঢের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—এই রূপ এমন গভীর এমন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে রেখেছিল তাকে যে পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রার অন্যতম আশা আকাঙ্খা ও সার্থকতার সমস্ত দরজাই চাবি দিয়ে বন্ধ করে ভালোবাসা মোহ ও কামনার উপাসনা করেছে বসে বসে সে—তাতে কি হ'ল?

জীবন তাকে পদে পদে ঠকিয়ে গেল শুধু; কল্যাণীও যেমনি দূর—তেমনি দূর হয়ে রইল। তবুও কল্যাণীকে পাওয়ার জন্য জীবনের সব দিকই একদিন সে অক্লেশে ছারখার করে ফেলতে পারত; কল্যাণী ছাড়া আর কোনো জিনিসেরই কোনো মূল্য ছিল না—কোনো নাম ছিল না যেন; হে বিধাতা, কোনো নামও ছিল না।

আর্টের কোনো অর্থ ছিল না, প্রতিষ্ঠার কোনো মানে ছিল না, সংগ্রাম সম্মান মনুষ্যত্ব সাধনা প্রতিভা এগুলোকে এমন নিষ্ফ মনে হ'ত সাধারণের ফূর্তি আহ্লাদ দিয়েই বা সে কি করবে? ভালোবাসা ছাড়া মনে হ'ত—আর সমস্তই সাধারণের জিনিস। নিজের রোজগারের টাকাটুকু মানুষের জন্য যে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথ ঠিক করে রাখে তাকেও সে প্রাণ ভরে অবজ্ঞা করেছে—

কিন্তু আজ এতদিন পরে এই জিনিসটাই চায় শুধু সে—নিজের রোজগারের নিশ্চিন্ত কয়েকটা টাকা মাসে মাসে—সেই সামান্য ভিত্তির ওপর যেটুকু স্বাধীনতা থাকে যেটুকু তৃপ্তি থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর জিনিসও আজ তাকে কেউ দিচ্ছে না। কলকাতা ছেড়ে দেশে এসে মায়ের ওপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে তার।

এমন অনেক কথা ভাবছিল অবিনাশ বিছানায় শুয়ে শুয়ে—এমন সময় কল্যাণী এল।

ব্যাপারটা যে কি হ'ল সহসা অবিনাশ বুঝতে পারল না; ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বললে—তুমি—

বিছানার এক পাশে এসে চুপে চুপে বসে কল্যাণী বললে—শুয়েছিলে—শোও।

—না—না—না—এখনই উঠতাম—

—বেড়াতে যেতে?

অবিনাশ বললে—আজ লক্ষ্মী পূজো না?

—হ্যাঁ

—এ রাতে তুমি কেমন করে এখানে এলে?

—দেখছই তো এসেছি

—পূজা ফেলে?

—পূজো খানিক হয়েছে—খানিক হচ্ছে—

—তোমাকে ছেড়ে দিল?

কল্যাণী—কৈ, তোমাদের বাড়ি পূজো হবে না?

—কে আর করে?

—আহা, লক্ষ্মী পূজো—

—লক্ষ্মী সরস্বতী সব একাকার—তুমি তো জানই সব—আহা, এই জ্যোৎস্নাটা—বেশ লাগছে। এতক্ষণ শুয়ে থেকে এই জ্যোৎস্নাটার দিকে ছিলাম পিঠ ফিরিয়ে—তুমি যদি না আসতে তা হ'লে হয়তো ঘুমিয়েই পড়তাম—

—কেন, এ বাড়ির লোকজন সব কোথায়?

—পাড়ায় গেছে হয়তো—

কল্যাণী বললে—তুমিও তো কলকাতায় ছিলে?

—হ্যাঁ।

—কবে এসেছ?

—দিন পঁচিশেক—

—আমি যে এখানে এসেছি তা জানতে না তুমি?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে—জানতাম

—একদিনও গেলে না যে বড়?

অবিনাশ বললে—তোমার কাছে গেলে মনটা খুব ভালো লাগত বটে—রাতে বেশ সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম—কিন্তু ঐ অব্দি—আর কি?

কল্যাণী অবোধের মত তাকিয়ে রইল।

অবিনাশের মনে হ'ল এই মেয়েটি বড্ড বোকা, ভেবেই তার বড় কষ্ট হল; মনে হ'ল, ছি, কল্যাণীর সম্বন্ধে এ রকম ভাবনাও এক দিন কত বড় অপরাধের জিনিস বলে মনে হত! আজো পৃথিবীর মধ্যে এই মেয়েটিকেই সব চেয়ে কম আঘাত দিতে চায় সে—নিক্তির মাপের চেয়ে একে একটু বেশি কষ্ট দিতে গেলেই নিজের মন অবিনাশের আজো কেমন একটা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু পড়া উচিত নয়।

কিন্তু, তবুও সেই ব্যথা কয়েক মুহূর্তের জন্য শুধু;—আগেকার মন তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না আর। এ একটা চমৎকার রফা।

কল্যাণীর সময় হয়তো খুব সংক্ষেপ; সে উশখুশ করছিল—

—কি ব্যাপার?

কল্যাণী বললে—একটু দরকার—

এই বলে সে থামল—

অবিনাশ তাকাল মেয়েটির দিকে

কল্যাণী বললে—শুনেছ নাকি?

অবিনাশ একটু ভেবে বললে—হ্যাঁ, শুনেছি

—কি বলো তো।

—তোমাদের বাসায় চন্দ্রমোহনবাবু আছেন—

কল্যাণী বললে—তাকে চেন নাকি?

—না।

—কোনো দিন দেখোও নি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এই এবার দেখলাম—এ দিককার রাস্তায় মাঝে মাঝে বেড়ায়, তোমার মেজদার সঙ্গে তোমাদের বগি গাড়িটাতে চড়ে—

কল্যাণী বিছানার ওপর আঁক কাটছিল—

একটু পরে বললে—তুমি কি বল?

অবিনাশ বললে—আমার মন ক্রমে ক্রমে নিরস্ত হয়ে উঠেছে—কাজ করতে ভালো লাগে না—দুঃসাধ্য জিনিসকেও সফল করে তুলবার মত উদ্যম হারিয়ে ফেলেছি—দিন রাত চিন্তা করে করে সব কিছুরই নিষ্ফলতা প্রমাণ করতেই ভালো লাগে শুধু—এই সব অদ্ভুত ব্যাপারের কথাই ভাবি আমি। এর পর আমার কাছে কি আর শুনতে চাও তুমি?

কল্যাণী বললে—আমি দিন রাত কি....চন্দ্রমোহনবাবুর জুতোর শব্দ শুনলেও আমার ভয় পায়—এমন কান্না আসে।

অবিনাশ একটু হেসে বললে—একদিন এই জুতোর শব্দ না ভালো লাগবে যে তা নয়

কল্যাণী বললে—তার আগে যে আমি মরে যাব।

—বুড়ী হয়ে তুমি বুড়ো চন্দ্রমোহনকে রক্ত গরম করবার জন্য মরকধ্বজ ঘষবে—

কল্যাণী বললে—মিছে কথা বাড়াও কেন? তুমি তো সব জান। তোমার কাছে এসে কি আমার অনেক কথা বলবার দরকার।

—শোন তবে—

কল্যাণী অবিনাশের দিকে তাকাল—

অবিনাশ বললে—অনেক দিন আমাদের দু'জনার দেখা নেই—তোমার খোঁজ তবুও আমি সব সময়েই রেখেছি—কিন্তু আমার ব্যাপারটা তুমি একেবারেই জানতে পারনি—

—তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে জানি—আর জানবার দরকার নেই—

মেয়েটিকেই অবিলম্বেই নিজের কথা সব জানিয়ে দিয়ে এই ক্ষণিক মুহূর্তের সৌন্দর্য অবিনাশ নষ্ট করতে গেল না।

এই জ্যোৎস্নায় এই রূপসীকে—এবং এই রূপসীর এই ক্ষণিক প্রেমকে প্রেমিকের মত না হ'লেও শিল্পী আয়ুষ্কালের মত উপভোগ করতে লাগল সে; মনে হল এ উপভোগ প্রেমিকের উপভোগের চেয়েও ঢের প্রবীণ,—একটায় মানুষ মানুষের মত আত্মহারা হয়—আর একটায় বিধাতার মত সমাহিত হয়ে থাকে। ঢের প্রবীণ—ঢের সুপরিসর এ উপভোগ।

কিন্তু এক আধ মিনিটের জন্য শুধু; তার পরেই নিজের অনিকেত পৃথিবীতে ফিরে এল অবিনাশ।

কল্যাণী বললে—চন্দ্রমোহনের মুখ দেখেছ তুমি?

—দেখেছি

—কেমন বলো তো—

অবিনাশ ভাবছিল—

কল্যাণী অত্যন্ত অসহায় বলে বললে—এমন মেনি বাঁদরের মত মুখ আমি মানুষের মধ্যে কোনো দিনও দেখিনি—তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না অবিনাশদা—

—মানুষের মুখের সৌন্দর্যই যদি এত ভালো লেগে থাকে তোমার তাহ'লে কোনো মুখ নিয়েই কোনো দিন তৃপ্ত হতে পারবে না—

—তোমাকেও কেউ ঘুষ দিয়েছে নাকি? তুমিও যে চন্দ্রমোহনের হয়ে কথা বলছ?

অবিনাশ একটু হেসে বললে—কল্যাণী—আমি—

—তুমি এ রকম অসঙ্গত কথা বল কেন

—জীবন ঢের অসঙ্গতি শিখিয়েছে; সবচেয়ে অসংলগ্ন জিনিসকেও দেখলাম শৈষ পর্য্যন্ত সবচেয়ে সত্য—

অনিবাশ বললে—আমার নিজের সুখকে এক সময় বেশ পুরুষ মানুষের মত বলে মনে হত; কিন্তু দিনের পর দিন যতই কাটছে চামড়া ঝুলে পড়ছে, মাংস খসছে—হাড় জাগছে—

তারপর এক এক দিন ঘুমের থেকে উঠে আরসীতে মুখ দেখে মনে হয়, এ কি হ'ল? নানা রকম বীভৎস জানোয়ারের আভাস মুখের ভিতর থেকে ফুটে বেরুতে থাকে। কিন্তু তাই বলে আমার কোনো দুঃখ নেই; মেয়েদের ভিতর যারা সবচেয়ে কুশ্রী তারাও আমাকে ক্রমে ক্রমে বসুশ্রী বলে ঠাট্টা করছে—হয়তো দূরে সরে যাবে আমার কাছ থেকে; আমিও তাদের কুৎসিৎ বলে টিটকারি দেব—

কিন্তু তারপর যখন কাজের সময় আসবে—তার যদি অনুমতি হয়—ওদের মধ্যে একজন পাঁচশো টাকার ইনস্পেকট্রেসকে বিয়ে করতে আমার একটুও বাধবে না; কি বাধা কল্যাণী? মুখের দোষগুণ শেষ পর্যন্ত আর থাকে না। টাকা জীবনটাকে সুব্যবস্থিত করে দেয়—

কল্যাণী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অবিনাশের দিকে তাকাল, নাক চোখ মুখ এমন কি দাঁতের ভিতর থেকেও যেন তার আগুন ঠিকরে পড়ছে; কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল অবিনাশ ঠাট্টা করছে; তামাসা করতে যে এ লোকটি খুব ভালোবাসে তা কল্যাণী বরাবরই জানে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই মনটা তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল প্রায়—আস্তে আস্তে—কেমন একটা অদ্ভুত অসঙ্গতির খোঁচা খেয়ে নিরুপায়ের মত হাসতে হাসতে বললে—তোমার মুখকে তুমি চন্দ্রমোহনের মত মনে কর?

—সেইরকমই তো হয়ে যাচ্ছি

—দেখছিই তো

—চন্দ্রমোহনের ও দোষটা তুমি ধোরো না—

—সে আমি বুঝব

অবিনাশ বললে—তাকে বিয়ে করতে হয় কর, না করতে হয় না কর; কিন্তু যে কুৎসিৎ মানুষ প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবেসেছে তাকে কুৎসিৎ বলে ঘৃণা করে খারিজ করবে তুমি এটা বড় বেকুবি হবে।

কল্যাণী নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

একটু পরে বললে—তুমি পরিবর্তিত হয়েছ বটে।

অবিনাশ বললে—তুমি হওনি? যদি না হয়ে থাক, হওয়া উচিত তোমার।

অবিনাশ বললে—আর্টিস্ট ছিলাম—কিন্তু আর্ট জীবনকে কি দিল? প্রেমিক হয়েও জীবনের কাছ থেকে কি পেলাম আমি?

—প্রেমিক হয়ে? এখন তুমি আর প্রেমিকও নও তাহ'লে?

—কাকে ভালোবাসব? একজন রূপসীকে নিয়ে আমার কি হবে কল্যাণী? আমি নিজে খেতে পাই না; প্রেম বা শিল্পসংস্থান মানুষের জীবনের থেকে যে দুরন্ত চেষ্টা সাহস কল্পনা দুঃসাধ্য পরিশ্রম দাবী করে আমার জীবনের যে মূল্যবান জিনিসগুলো খরচ হয়ে গেছে সব—কিছু নেই এখন আর। উপহাস আছে এখন; জীবনের গতিশীল প্রগতিময় জিনিসগুলোকে টিটকারি দিতে পারি শুধু—নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোরের থেকে রাত, রাতের থেকে ভোর সৌন্দর্যকে মনে হয় কাদা আর লাল স্রোত, ভালোবাসাকে মনে হয় পুতুলখেলা, পলিটিক্সকে মনে হয় উতোর, আর্টকে ভাঁড়ামি, জীবনের মহত্ত্ব গুরুত্ব মঙ্গল বলে যে সব জিনিস নিয়ে লোকে দিনরাত হৈ হৈ করছে সবই আমার কাছে ভড়ং ঢং নিষ্ফলতা শুধু। আমি আজো বুঝি না এরা সত্য—না আমি সত্য। আমার কোনো বিধাতা নেই। আমার মার দুঃখ কষ্ট দেখে একটা চাকরির সামান্য ক'টি টাকা ছাড়া অন্য কোনো কিছু জিনিসের জন্যই আমার কোনো প্রার্থনা নেই। কিন্তু সে চাকরিও আমাকে দেয় না কেউ?

কল্যাণী কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইল।

অবিনাশ বললে—চন্দ্রমোহন তোমাকে বিয়ে করবে এ জন্য ঈর্ষাও নেই আজ আমার; তেমন কোনো একটা যৌনকাতরতাও নেই। কিন্তু গত বছর হ'লে এই শেষের জিনিসটাও কি ভয়াবহ হয়ে উঠত—অবাক হয়ে আজ ভাবতে পারা যায়। এক বছরের মধ্যে কতখানি ঘুরে গেছি—

কল্যাণী বলল—উঠি

—আচ্ছা

কিন্তু তবুও সে বসে রইল—

অবিনাশ বললে—কার সঙ্গে যাবে?

ছোড়দা আসবে—

কিশোর কোথায়?

—তোমাদের পাশের বাড়িতেই—

—হিমাংশুবাবুর বাড়ি?

—হ্যাঁ; ডেকে দেবে?

আচ্ছা দেই

অবিনাশ উঠল

কল্যাণী বললে—সত্যিই ডাকতে গেলে

—তুমি বাসায় যাবে না?

কল্যাণীর চোখ ছলছল করতে লাগল—

অবিনাশ একটা চেয়ার টেনে বসে বললে—দিব্বি রাত—লক্ষ্মীপুজোর—

—সে দিনগুলো ফুরিয়ে গেল কেন?

—কোন দিন

—যখন তুমি ভালোবাসতে পারতে—

অবিনাশ চশমাটা খুলে বললে—ফুরুলো তো

—আমরা তো ফুরোয় নি—

—অনেক স্বামী স্ত্রীর জীবনই আমি দেখেছি—ভালোবাসা কোথাও নেই, সৌন্দর্যের মানে শিগগিরই ফুরিয়ে যায়; সমবেদনা থাকে বটে—কিন্তু সমবেদনা তো প্রেম নয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী বললে—আমি স্বামী স্ত্রীর জীবনের কথা বলছি না—

অবিনাশ বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে—একটা গল্প মনে পড়ছে—এমন লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সেই গল্পটার ভেতর ঢের মাধুর্য জমে ওঠে বটে। তোমাকে নিয়ে যদি আজ এই জ্যোৎস্নায় কোনো দূর দেশে চলে যাই আমি যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পায় না—তুমি আমার স্ত্রী হও, আমি তোমার স্বামী হই—তাহ'লে আমি কোনো চরিতার্থতা পাব না।

কল্যাণী বুকের ভিতর কেমন যেন ক'রে উঠল, কোনো কথা বলতে পারল না সে।—এই, জ্যোৎস্না উধ্বে আবার ভোর আসবে দুপুর আসবে—অমাবস্যা আসবে—বৃষ্টি আসবে

—নানা দিক থেকে অনেক বিরুদ্ধাচারের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সে সংগ্রাম তুমি হয়তো কিছু দিন করতে হবে! কিন্তু আমি পারব না।

কল্যাণী বললে—কেন?

—ভালোবাসা ও সৌন্দর্যকে অন্তঃসারশূন্য মনে হয় যে

—কেন?

—সৌন্দর্য তো একটা ফুলের পাপড়ির মত! কি তার মূল্য একটা কবিতার খাতায় ছাড়া এ পৃথিবীর আর কোথাও তার কোনো দাম নেই। মন আমার আজ কবিতার খাতার বদলে বিলের খাতায় ভরে উঠেছে—

কল্যাণী আঁতকে উঠল

অবিনাশ বললে—ভালোবাসাও তো শেষ পর্যন্ত লালসায় গিয়ে দাঁড়ায় শুধু— লালসার কি যে মূল্য তা গত দু'বছরের আমি খুব বুঝতে পেরেছি। সে শুখখুরির কাছে তোমার জীবনকে বিসর্জন দিতে চাই না আমি, আমার জীবনকেও নষ্ট করতে পারি না—

কল্যাণী একটি মৃতপ্রায় মানুষের মত কে কোণে জড়সড় হয়ে বসেছিল

অবিনাশ বললে—কিন্তু এও সব হ'ত আমাদের—খুব ভালোই হত যদি চন্দ্রমোহনের মত টাকা থাকত।

অবিনাশ একটু কেশে বললে—কিম্বা তোমার মেজদার মত টাকা থাকলেও আমি একবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু আমার কিছুই নেই।

উনিশ

সেই রাত্রেই—

লক্ষ্মীপুজোর অশেষ জ্যোৎস্নার মধ্যে লাল রাস্তার পর কাঁকরের আরো লাল রাস্তার বাঁক ঘুরে ঘুরে বগি গাড়িটা নিঃশব্দে চলছিল—যেন এ চলার সীমা শেষ নেই। কিন্তু তবুও খুব তাড়াতাড়িই যেন পঙ্কজবাবুর গাড়ি বারান্দায় এসে ঝট করে গাড়িটা থেমে গেল। ঘোড়াটা খট খট করে খানিকটা লাফিয়ে উঠল—পাগলামি করল—চাবুক খেল—তারপর সব চুপ।

কল্যাণী হঠাৎ চমকে উঠে বুঝতে পারল যে বাসায় এসে পৌছেছে—

ছোড়দার পিছনে পিছনে তেতলা অব্দি গেল কল্যাণী—

কোথাও কেউ নেই।

কল্যাণী বললে—কোথায় গেছে সব ছোড়দা—

—কে জানে কোথায়?

দোতলায় নেমে সিদে খাবার ঘরের দিকে চলে গেল কিশোর, কল্যাণীও দোতলায় নামল—খেতে গেল না আর। হলের একটা চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে ছিল—কিশোরের গলার আওয়াজ রান্নাঘরে ক্রমাগত খন খন করছে—কাকে যেন ধমকে ধমকে সে ভূতঝাড়া করে দিচ্ছে—

কিশোর অবিশ্রাম বকে চলছিল—কিন্তু ছোড়দার গলার অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে এল যেন কল্যাণীর কাছে।

কে কিছুই দেখছিল না—বুঝছিল না।

কিশোর খেয়ে এসে কল্যাণীকে অগ্রাহ্য করে ঘুমোতে চলে গেল।

ওসমান এসে বললে—দিদিমণি

কল্যাণী নড়ে উঠল।

ওসমান বললে—কত্তারা বোধ হয় কেউ আজ রাতে ফিরবেন না

—কোথায় গেছে?

যাত্রা না পাঁচালী শুনতে হরিবাবুর হাবেলীতে—

কল্যাণী বললে—কে কে গেছেন?

—ছোটবাবু আর আপনি ছাড়া সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—মাও!

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা তুমি যাও।

—খাবেন না?

কল্যাণী বললে—কে?

—চন্দ্রমোহনবাবু—আপনি—

—তিনি কোথায়?

—বাগানে বেড়াচ্ছেন—

—খান নি?

—না

—তাঁর ডেকে খেতে দাও গিয়ে

—এই টেবিলেই দেব?

—দাও

—ডেকে আনি?

—খাবার ঠিক হয়েছে?

—হ্যাঁ

—আন ডেকে

—ওসমান চলে গেল।

কল্যাণী ভাবছিল—সে তেতলায় চলে যাবে—কিম্বা নিজের ঘরে যাবে ঘুমুতে; কিন্তু বসেই রইল সে—মস্ত বড় গোল ডিনার টেবিলটার পাশে একটা চেয়ারে—খাবারের জন্য ও চন্দ্রমোহনের জন্য স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষ করছে যেন সে। কল্যাণীর মনে হচ্ছিল, এ কেমন! কিন্তু এমনই তো হ'ল। জিনিসটাকে খুব বেশি অঘটন বলেও মনে হচ্ছিল না তার।

চন্দ্রমোহন এল।

কল্যাণী বললে—বসুন।

বলেই শিউরে উঠল। নিজের প্রতি বিরূপ কাতর ব্যথিত চোখ দু'টোকে নীলাম্বরীতে ঢেকে তেতলার দিকে ছুটে যাবার ইচ্ছে করল তার। কিম্বা এই মেঝের ইঁট চুণ কাঠের ভিতর মিশে যেতে ইচ্ছা করছিল তার—কেউ কোনো দিন খুঁজে পাবে না তাকে আর।

কিন্তু তবুও সময়বিধাতা তাকে বসিয়েই তো রাখলেন।

চন্দ্রমোহনের ভাত এল; কল্যাণীরও

কল্যাণী বললে—ওসমান

—হুজুর

—এখন না, আমি পরে খাব।

ওসমান থালা তুলে নিয়ে গেল—

চন্দ্রমোহন অত্যন্ত মর্মপীড়িতের মত বললে—কেন? পরে কেন?

কল্যাণী বললে—আপনি খান।

—আপনি কেন খাবেন না?

—খাব তো; পরে

—আমার সামনে খেতে খারাপ লাগে

কল্যাণী বললে—আপনার ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে

—আমি খাচ্ছি

একটু হেসে বললে—আপনি না খেলেও আমি খাচ্ছি—কাউকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে আমার নেই।

চন্দ্রমোহনবাবুর কখন কি লাগে ওসমান তদারক করে যাচ্ছিল; কল্যাণী তাকিয়ে দেখছিল মাঝে মাঝে— নিপুণ খানসামার মত এসে বুঝে শুনে দরদ দিয়ে লোকটাকে খাওয়াচ্ছে। মাথাটা একটু কাৎ করে জানালার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে রইল কল্যাণী।

খাওয়া হয়ে গেলে ওসমান টেবিল পরিষ্কার করে নিয়ে গেল—কল্যাণীর মনে হ'ল এখন সে চলে যেতে পারে।

চন্দ্রমোহন মুখ ধুয়ে গামছায় মুখ মুছে টেবিল সাফ শেষ আগেই দাঁড়িয়েছে এসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসমান চলে যাওয়ার পর চন্দ্রমোহন বললে—আমি কাল পশু তক এখান থেকে চলে যাব—

কল্যাণী মাথা হেঁট করে বসেছিল—

চন্দ্রমোহন বললে—আপনার বাবার মত পেয়েছি—আমারও কলকাতায় ঢের কাজ আছে ভাই—

কল্যাণীর বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করছিল। অস্ফুট স্বরে বললে বাবার মত? কিসের মত?

চন্দ্রমোহন বললে—তা তো আপনি জানেনই—

কল্যাণী বললে—আপনার কাছে একটা অনুরোধ

চন্দ্রমোহন হাসি মুখে তাকাল

কল্যাণী বললে—আপনি যদি মানুষ হন বাবাকে আর বিরক্ত করবেন না—আমাদেরও না

চন্দ্রমোহন ধীরে ধীরে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে অত্যন্ত করুণ হয়ে বললে—আপনার বাবাকে কি আমি বিরক্ত করেছি?

কল্যাণী একটু চুপ থেকে বললে—না হয় সেধেই বাবা আপনাকে ভালো বেসেছেন—কিন্তু—

চন্দ্রমোহন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু আর কেন কল্যাণী

কল্যাণীর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই এমন কান্না এল তার—অতি কষ্টে কান্না চেপে চন্দ্রমোহনকে বললে—কি চান আপনি?

চন্দ্রমোহন অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে—তুমি দয়াময়ী; তোমার মতন দয়া আর কারুর নেই। আমি প্রথম দিন দেখেই বুঝেছি—শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যেন আমার মৃত্যু না হয়—

কল্যাণী ঠোঁটে আঁচল গুঁজে কঠিন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল—নড়বার চড়বারও শক্তি ছিল না তার।

চন্দ্রমোহন একটু এগিয়ে এসে কল্যাণীর হাত ধরে বললে—তুমি আমাকে ভালোবাস—বল, তুমি আমাকে ভালোবাস—

কল্যাণী হাত খসিয়ে দিয়ে বললে—না, ছাড়ুন—

—বল, আমাকে ভালোবাস তুমি কল্যাণী—বল ভালোবাস—

কল্যাণী চোখের জলে একাকার হয়ে বললে—না—না—না—কোনো দিনও না—কোনো দিনও আপনাকে আমি ভালোবাসি নি—আপনি সরুন—আমাকে যেতে দিন—যেতে দিন—

চন্দ্রমোহন বললে—আমি এখনও জানি তুমি আমাকে ভালোবাস—

কল্যাণী অবোধের মত কাঁদতে কাঁদতে বললে—কে বলেছে সে কথা আপনাকে—আপনি ভুল করেছেন—ভুল করেছেন—ভুল করেছেন—

কল্যাণী চীৎকার করে উঠে বললে—আপনাকে দেখলে ভয় করে—আপনাকে দেখলে ঘেন্না করে আমার—

বলতে বলতে কল্যাণী শোবার ঘরের দিকে ছুটে যেতে লাগল—নিষ্কৃতি নাই—নিষ্কৃতি নাই—একটা ব্যাধের জাল যেন কল্যাণীকে ক্রমে ক্রমে ঘিরে ফেলছে—

চন্দ্রমোহন মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে কল্যাণীর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে বললে—আমাকে মেরে ফেল—আমাকে মেরে ফেল কল্যাণী।

সমস্ত শরীর চন্দ্রমোহনের যেন কেমন নিষ্পেষিত পাখির মত—মাছের মত কল্যাণীর পায়ের নিচে লুটিয়ে লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল। সে কি কাতরতা—মানুষ কোনোদিন এত কাতর—এমন অনাথ শিশুর চেয়েও ভয়াবহ অথর্বতার পরিক্রমে বোকা মেয়েমানুষকে স্তম্ভিত করতে পারে—কল্পনাও করতে পারেনি কোনো দিন কল্যাণী।

ধীরে ধীরে কান্না থেমে গেল তার। কান্না থামতেই নিজেকে সে ধিক্কার দিতে লাগল; সে বোকা মেয়েলোক ছাড়া আর কি? নইলে এই মানুষটার কাছে এমন করে সে ঠকে যায়!

বিচলিত হয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে চন্দ্রমোহনের দিকে তাকাল কল্যাণী—এই লোকটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বীভৎসতাও নয় আজ আর—আজকের আকাশ মাঠ জ্যোৎস্না পৃথিবীর কি একটা নিগূঢ় কাতরতা ও নিষ্ফলতার প্রতীক ব্যবসায়ী—না সত্যিই প্রতীক এই চন্দ্রমোহন।

কল্যাণী বললে—উঠুন।

কোনো সাড়া দিল না চন্দ্রমোহন।

কল্যাণী বললে—উঠুন উঠুন—বলেছিলাম ঘেন্না করি, ভয় করি—কিন্তু এখন আর করি না সে সব কিছু—

চন্দ্রমোহন মেঝের ওপর মাথা উপুড় রেখেই বললে—বল ভালোবাস—

কল্যাণী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে কি বললে, চন্দ্রমোহন ছাড়া কেউ আর তা শুনতে পেল না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুড়ি

চন্দ্রমোহনের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে হবার পর বছর খানেক কেটে গেছে।

কল্যাণীর সাত মাস চলছে—

জরায়ুর শিশুটি যখন তাকে তেমন বিশেষ যন্ত্রণা দিচ্ছিল না, দিনটা মন্দ লাগছিল না, স্বামী কাছে ছিল না—তখন একটু অবসর করে মাকে সে চিঠি লিখতে বসল ঃ

এই এক বছরের মধ্যে তিন চারখানা চিঠি মাত্র তোমাকে লিখেছি মা। বাবাকে এক খানাও লিখতে পারিনি। বাবার দুইখানা চিঠি আমি ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলোর কোনো উত্তর দিয়ে উঠতে পারি না। বাবা কি রাগ করেছেন?

তোমরা তো জানতেই পেরেছ মা যে সাত আট কোটি টাকার কিছু ব্যবসা নয়—ব্যবসাই নয়; ব্যাংকে ওঁর পনের হাজার টাকা আছে মাত্র। তারি সুদে আমাদের চলে। উনি অনেক সময় বলেন, ব্যবসা না করলে এ টাকা বাড়বে কি করে? ব্যবসা করতে চান। কিন্তু আমি জানি—ব্যবসাবুদ্ধি ওঁর একেবারেই নেই। চার দিক থেকে লোকেরা এসে ওঁকে প্রায়ই ফুসলায়—উনি বিচলিত হয়ে যান। আমি এ রকম করে শক্ত করে চেপে না থাকলে এ ক'টি টাকা অনেক আগেই মারা যেত। তখন আমরা দাঁড়াতাম কোথায়, সেই পনেরো হাজার টাকার মধ্যেও সাত হাজার টাকা বাবার দেওয়া—আমার বিয়ের সময় যা যৌতুক দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা।

মোট পোনেরো হাজার টাকা আমাদের সম্বল—বিয়ের আগে ওঁর আট হাজার টাকা ছিল মাত্র—কিন্তু ভুল খাতা দেখিয়ে ভাওতা দিয়ে বাবাকে ও মেজদাকে উনি প্রতারিত করেছেন বলে বাবা আজো ওঁর ওপর মর্মে মর্মে চটে আছেন—চিঠিতে লোকের মুখে ক্রমাগত ওঁকে গাল পাড়েন। তুমি তো তা কর না মা। তুমি জান মেয়ে মানুষের স্বামী ছাড়া কি আর থাকতে পারে। তুমি বাবাকে বলে দিও তিনি যেন ওঁকে এরকম করে আর নির্যাতন করতে না যান—তাতে আমার বড় বেশি আঘাত লাগে। আমাকেও যা চিঠি লিখেছেন তাও ওঁকে গাল পেড়ে—আমাকে না জেনে না বুঝে জলে ফেলে দিয়েছেন এই সব কথা লিখেছেন। এই জন্য আমার এত খারাপ লেগেছে যে বাবার চিঠির উত্তরও দেইনি।

বাবাকে বোলো তুমি যে আমাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়নি—আমার স্বামীর কাছেই আমাকে রাখা হয়েছে।

এ সব কথার মর্ম বাবা হয়তো ভালোবাসবেন না—আমার স্বামী তার এমন বিষদৃষ্টিতে! কিন্তু তুমি তো বুঝবে।

এর আগে আমরা বালিগঞ্জের দিকে একটা বাড়িতে ছিলাম; ভাড়া লাগত না। ওঁর দাদার বাড়ি। দু'টো কোঠা আমাদের জন্য আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। বেশ খোলামেলা ছিল—সামনে একটা মস্ত বড় মাঠ; সেখানে ছেলেরা ফুটবল, হকি, ডাণ্ডাগুলি—আরো কত কি খেলত। আমি অনেক সময় জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম।

বেশ মজা লাগত আমার—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতে। ছোড়দার সঙ্গে—আর ঐ ভূষণ আর আকুশির সঙ্গে ছেলেবেলায় আমিও তো কত খেলেছি!

ভূষণ কোথায় মা এখন? বিয়ে হয়ে গেছে? কোথায় হ'ল? আকুশি কোথায়?

বালিগঞ্জের বাড়িতে বেশ আলো হাওয়া আসত। খুব শান্তি ছিল। বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। একটা ঠিকা ঝি ছিল। সেই সব করে দিত। ওঁর দাদাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেতাম।

সারাদিন সেলাই করতাম—আর মাঝে মাঝে উনি আমার সঙ্গে তাস খেলতে চাইতেন। দু'জনে মিলে খেলতাম—বেশ মজা লাগত।

ওঁর দাদার একটা এস্রাজ ছিল—সন্ধ্যার সময় সেটা বাজাতাম। এস্রাজ বাজাতে জানি না আমি অবিশ্যি। উনিও জানেন না। কিন্তু ঐ এক রকম হত।

কিন্তু সে বাড়িটা আমাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে। ওঁর দাদা বললেন যে তাঁর নিজের লোকজন আসবে। শ্যামবাজারের দিকে বাড়ি ভাড়া করতে হয়েছে আমাদের; গোটা বাড়ি অবিশ্য নয়—দু'টো ঘর ভাড়া করেছি—একটা রান্নাঘর আছে; রান্নাঘরটা এক তলায়—ঘর দু'টো দোতলায়—এই সময় ওঠানামা করতে হয়—এই যা কষ্ট—এখন আমার সাত মাস। উনি বলেন একটা রাঁধুনি রেখে দি—কিন্তু তাতে বড় পয়সা খরচ; এখন আমাদের সম্পূর্ণ সুদের টাকায়ই চালাতে হচ্ছে শুধু; পঁচাত্তর না সত্তর কত করে পান মাসে, তার থেকে বাড়ি ভাড়াই দিতে হয় পঁয়ত্রিশ—আর পঁয়ত্রিশে আমাদের চালাতে হয়। কাজেই রাঁধুনি রাখব কি করে? ঠিকা ঝিও রাখি নি। সব কাজ আমিই করি তুমি কিছু বেভো না মা—ভারী জিনিস কিছু তুলতে হয় না; দু'জন মানুষের রান্না তো মোটে—কত আর ভার হবে?

কল আছে—জলের জন্য বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না।

ওঠানামাও বেশি করি না; সেই ভোরে নামি—একেবারে রান্না সেরে—স্নান করে ওঁকে দিয়ে আমি খেয়ে তবে গিয়ে ওপরে উঠি। বেশি হাঙ্গাম পোয়াতে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসাটা গলির ভেতরে। তাই বড্ড অন্ধকার; হাওয়া তেমন খেলে না। আমাদের ঘর দু'টোর দক্ষিণ পূব বন্ধ—উত্তরের দিকে দু'টো জানালা—জানালার পাশেই কাদের বাড়ির সব প্রকাণ্ড দেয়াল—একেবারে আকাশ অব্দি চলে গিয়েছে। আকাশটাকে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না—সেই যেন কেমন লাগে যেন মাঝে মাঝে।

একেবারে হাঁফিয়ে উঠতে হয়। গলির ভেতর আমের খোসা, নেংটি ইঁদুর মরা, পচা বিড়াল, ভাত তরকারী উচ্ছিষ্ট, কাদের একটা গোয়াল, দু'এক জন কুষ্ঠ রোগী এইসব মিলে গন্ধ হয় বড়—কাজেই জানালার দিকে বড় একটা যাই না।

কিন্তু আমার মনে হয় পেটে ছেলে আছে বলেই বোধ হয় মনের এ রকম আঠকানে অবস্থা—শরীরটাও খারাপ লাগে। তাই না মা?

ছেলে হয়ে গেলে আবার বেশ আরাম পাব—উনিও তাই বলেন; শিগগিরই হয়ে যাবে—আর বেশি দেরী নেই; উনি বলেছেন তখন ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে রোজ বিকেলে একটু একটু বেড়াবেন।

বড়দা কি এখনও বিলেত? তার কোনো চিঠি পাও? বড়দা কি আর দেশে ফিরবে না? কতদিন দেখিনি তাকে। যখন বিলেত চলে যায়—আমার মনে আছে আমি ঘুমুচ্ছিলাম—তুমি আমাকে জানালে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে প্রণাম করলাম—মেজদা নাকি কলকাতায় এসেছিলেন? আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন? তিন চার বার কলকাতায় এসেছিলেন—অথচ একবারও এদিকে এলেন না। জানতে পেরে আমি প্রত্যেকবার কত কেঁদেছি—তোমাকে লিখেছি—কিন্তু তবুও মেজদা একবারও দেখা করতে এলেন না। ওঁর ওপর না হয় তাঁর রাগ থাকতে পারে। কিন্তু আমি তাঁর বোন—নই কি? তবে কেন তিনি আমাকে কাঁদালেন? ওরা আর আমাকে বোন বলেও মনে করে না—এই জন্য আমার এত কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে বুক ফেটে যেতে থাকে।

কিন্তু উনি এসে ধীরে ধীরে আমাকে সান্ত্বনা দেন। তাইতে আমার একটু ভালো লাগে।

ছোড়দা মাঝে মাঝে এখানে আসে—কিন্তু ওঁকে দেখলেই নাক খিঁচে উঠে চলে যায়। এতে আমার বড় খারাপ লাগে। ছোড়দা কেন এ রকম করছে? ছোড়দাকে তুমি লিখে দিও এ রকম করে না যেন আর, সব মানুষই মানুষ, বিশেষ করে যে মানুষ ওঁর মত জীবনের কাছ থেকে এত বেদনা বিড়ম্বনা পাচ্ছে তাকে ঘৃণা না করে একটু সমবেদনা দেখালেই মানুষের কাজ হয়।

তুমি কি একবার কলকাতায় আসবে না? তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে; বাবাকেও। কিন্তু তোমরা কেউ আস না কেন?

সন্তান না হলে আমি দেশেও যেতে পারি না। আগে আমাকে দেশে যেতে লিখেছিলে। কিন্তু তখন মেজদা কলকাতায়—অথচ আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না, সেই জন্য যাইনি।

কিন্তু এ সব অভিমান এখন আর আমার নেই। আগে নানা জিনিসেই ঢের কষ্ট হত,—কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে সব যেন বুঝতে পারছি—আঘাত ক্রমে ক্রমেই কম অনুভব করি—একদিন হয়তো কোনো রকম আঘাত বোধই থাকবে না।

এই এক বছরের ভিতর আমি ঢের বড় হয়ে গেছি, মা। আসরীতে দেখলে হাসি পায়; উনিও মাঝে মাঝে আমার চেহারা দেখে হাসেন, দুঃখ করেন, কিন্তু ঠাট্টা করেন না, বকেন না। নিজেকে মাঝে মাঝে কেমন আধবয়সী বুড়োমানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু মনটাই যে আস্তে আস্তে ঢের বয়স্ক হয়ে গেছে। বিয়ের আগের সেই ছেলেমানুষী নেই, অভিমান নেই, অহঙ্কার নেই, ডায়েরী লিখবার সাধ নেই, সিনেমা দেখার প্রবৃত্তি নেই, কি সব অদ্ভুত বই পড়তাম—সে সবের কথা মনে পড়লে এখন গায়ে জ্বর আসে। মেয়েদের কাছে চিঠি লিখিনি আর—ইচ্ছে করে না। কি হবে লিখে? তাদের সঙ্গে দেখা করতেও ভয় করে। তারা দিন রাত এত সব বড় বড় কথা বলে—তাদের ভাব, ভাষা, চিন্তা ভালো করে বুঝতে হ'লে ঢের বিদ্যা বুদ্ধি চাই, কিন্তু এই সবই আমার কাছে অসার বলে মনে হয়। এ সব দিয়ে কি হবে? বিয়ের আগের সেই ভালোবাসাও নেই। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা অন্য রকম—সেবা ও শ্রদ্ধার জিনিস। উনি বলেন ভালোবাসারও জিনিস। কিন্তু আমি বুঝি না। হয়তো স্বামীরা ভালোবাসে, স্ত্রীরা শ্রদ্ধা করে। কিম্বা যে মেয়েমানুষদের চরিত্র খারাপ তারা অন্য পুরুষদের সঙ্গে ভালোবাসা করে বেড়ায়। তাই না মা?

ওঁর এক বন্ধু আছেন—ডাক্তার—বুড়োমানুষ—মিডওয়াইফারি খুব ভাল জানেন। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার সময় এসে এখানে চা খান; ও আমাকে দেখে যান। ক'দিন থেকে বিছানার ওপর আমাকে চিৎ করে শুইয়ে পেটের কাপড় উঠিয়ে পেট নেড়ে চেড়ে দেখছেন। কাল পেটের ওপর কান রেখে অনেকক্ষণ কি যেন শুনছিলেন। বুড়ো মানুষ না হ'লে আমার বড় লজ্জা করত।

তারপর বললেন—ছেলে হবে। পেট খুব বড় কিনা, কাজেই সন্তানও খুব বড়—কাজেই ছেলে। তা ছাড়া নড়াচড়ার রকম দেখেও উনি বুঝেছেন যে ছেলেই হবে।....

ছেলেই হ'ল—

যেই দেখে সেই বলে 'একি, এ যে আর এক চন্দ্রমোহন এল—'

ঠিক তেম্নি মেনি বাঁদরের মত মুখ, হলদে রং, চোখ পিটপিট করছে—ভুরু দু'টো রোঁয়ায় ভরা—মুখের ভিতর কেমন একটা নির্মম ধাপ্পাবাজির ইসারা—তারপর কেমন একটা নিঃসহায়তা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কল্যাণীর চোখে এ সব কিছুই ধরা পড়ে না। সুস্থ সন্তানকে মাই খাইয়ে নিজের বুকের ভিতর জড়িয়ে এমন ভালো লাগে তার। এম্নি করে মাস আষ্টেক কেটে গেল—ছেলের দাদা দিদিমা কেউ তারে দেখতে এল না; কল্যাণীরও দেশে যাওয়া হ'ল না। চিঠিও সে আর পায় না কারুর—লেখেও না কাউকে।

একদিন দুপুরবেলা চন্দ্রমোহন দেখল যে কল্যাণী ঘুমুচ্ছে—সমস্ত শরীরের জামা কাপড় সবই প্রায় খোলা—ছেলেটিকে মাই দিতে দিতে কি এক রকম আদরে ও পিপাসায় নিজের শরীরের সাথে ছেলের শরীর একেবারে মিশিয়ে ফেলেছে যেন সে—মিশ্রণ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই যেন চায় না কল্যাণী—জিনিসটাকে সোজাসুজি বুঝতে পারল না চন্দ্রমোহন। উদ্ভট ভাবে ভাবলে— এই ছেলেটা তো সে নিজেই—দিকবালিকারা মাথা নেড়ে নেড়ে বললে—তুমিই তো।

এই স্বর্গসম্ভবা কল্যাণীর মত মেয়ের জীবনেরও এক বিরাট উচ্ছৃঙ্খলতা—উপহাস, নোংরামি, অধঃপতন, ও নিজের মনের এক অপরিসীম লালসার রসে মন তার উত্তেজিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সম্প্রতি উপায় নেই—রাত্রে হবে।

কল্যাণী আবার আট মাস—আর এক চন্দ্রমোহন আসছে।

(গভীর পরাক্রমের সঙ্গে আপাতত নিজেকে সংযত করে নিয়ে চন্দ্রমোহন বেরিয়ে গেল।)

জুলাই ১৯৩২, কলকাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~